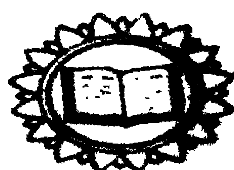
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬০



প্রকাশক : শ্রীশেখর ঘোষ। সুমিত্রা প্রকাশনী।
সি ৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক : শ্রীমধুসূদন দাস। সত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস।
৪৪ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র।

প্রচ্ছদমুদ্রণ ও ব্লক : অ্যাডসনস্।
সি ৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-৭০০০০৭

বাঁধনী : বিচিত্রা বাঁধনী।
১৮, রাধানাথ বিশ্বাস লেন কলিকাতা-৭০০০০৯

পরিচিতি

সমুদ্রের 'সুবিস্তীর্ণ জলরাশির নিচে যেমন শুক্তিগর্ভে মুক্তা নিহিত থাকে, তেমনি দেশবিদেশের বিভিন্ন মহাকাব্যের জঠরে জঠরে ছোটগল্প নিহিত ছিল উপাখ্যানের আকারে। তারপর একদিন সে পড়ল সুকঠোর রসজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। তখন অবসান ঘটল তার ভ্রূণাবস্থার, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হল মহাকাব্যের গর্ভ থেকে। তারপর কালক্রমে সে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হল, তার বংশলতিকা লতিয়ে লতিয়ে পার হতে লাগল শতাব্দীর পর শতাব্দী। অবশেষে সে যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর নাগাল পেল, তখন আর কে বলবে যে, মহাকাব্য হল তার আদিমাতা? প্রাগৈতিহাসিক ক্রোম্যাগ্নঁ (cro-magnon) মানুষেরই ক্রমপরিণতি আজকের মানুষ—এ-কথা কেবল নৃবিজ্ঞানীর গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই সত্য।

তবু এ-কথা সত্য যে, মহাকাব্যেরই নাড়ী ছিঁড়ে ছোটগল্প ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এদিক থেকে সে উপন্যাসের সহোদরা। দুয়েরই জন্ম মহাকাব্য থেকে, এবং বেশ কিছুকাল ধরে দুটিরই জীবনযাত্রা ছিল প্রায় সমরূপ—যে-কোন একটি ঘটনা-প্রবাহের কাহিনী; পার্থক্য ছিল শুধু আয়তনে। ছোটগল্প যেন দুলালী উপন্যাসের কৃশকায়া অনুজা। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ছোটগল্পের লক্ষণীয় রূপান্তর আরম্ভ হল। কেবল আকৃতিতেই নয়, প্রকৃতিতেও উপন্যাসের সঙ্গে তার পার্থক্য ঘটল। এবার থেকে উপন্যাসে একটি জীবনের বা একটি ঘটনার রূপ দেবার চেষ্টা করা হতে লাগল মহাকাব্যের অনুকরণে; পক্ষান্তরে, ছোটগল্পে তুলে ধরা হতে লাগল একটি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মাত্র অনুভূতি। উপন্যাস হল আলাপ-বিস্তার সহযোগে সম্পূর্ণ একখানা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর ছোটগল্প সেই গানেরই একটি মাত্র মূর্ছনা হঠাৎ খেয়ালবশে উচ্চারিত—সে যেন অতর্কিতে দেখতে পাওয়া "a violet by the mossy stone"। বস্তুত, ছোটগল্পের মধ্যে লিরিক কবিতার সুর জেগে উঠল, এবং কালক্রমে সেই সুরের অভিব্যক্তিই হয়ে উঠল মুখ্য, ঘটনা হয়ে পড়ল গৌণ। মপাসাঁ, চেখভ ও রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে এই লিরিক সুর অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় পূর্ণ হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অপরূপ বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করল।

বিচিত্ররূপিণী ঊনবিংশ শতাব্দী। ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ঁ, ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডি, রাশিয়ার নাইহিলিস্ট আন্দোলন, প্রাচ্য পৃথিবীতে ইংরেজের

প্রতিষ্ঠা; জাহাজ-নির্মাণে লোহার ব্যবহার, বাষ্পশক্তি বিদ্যুৎ রেলগাড়ি প্রভৃতির আবিষ্কার ও উদ্ভাবন; ইংল্যাণ্ডে Romantic Revival "নব্য [illegible]" আন্দোলন, নীৎশে ও মার্কস, পাশ্চাত্যে উপনিবেশের প্রচার; এবং আরও কত-কি মিলে সারা বিশ্বের চিন্তাধারায় এক বিরাট বিপ্লব নিয়ে এল। এই বিপ্লব দেখা দিল ছোটগল্পে অতি প্রকট হয়ে।

বৈচিত্র্যবহুল ঊনবিংশ শতাব্দী সাহিত্যে তথা ছোটগল্পে এনে দিয়েছিল সর্বংসহা সহানুভূতি। এরই ফলে ক্ষুদ্র মানুষের, তুচ্ছ মানুষের দুর্বলতাগুলিও যে অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক পরিণতি, তা প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল লেখকবৃন্দের লেখনী সব। কোন মানুষই মন্দ হয়ে জন্মায় না—অবস্থা-বিপর্যয়ই তাকে মন্দ করে তোলে: এই হল অধিকাংশ ছোটগল্পকারদের প্রধান উপপাদ্য। আমাদের দেশে এর প্রথম স্পষ্ট উদাহরণ পাই মধুসূদনের রাবণে। বাল্মীকির রাবণ পাঠকের বিভীষিকা, কিন্তু "মেঘনাদবধ-কাব্যে"র রাবণের দুঃখে আমরা কাঁদি। এই লক্ষণ হল, শুধু ছোটগল্পেরই নয়, সাহিত্যের সকল শাখাতেই প্রকট হয়ে উঠল। ফ্লবেয়ার-এর "মাদাম বোভারি" থেকেই এই জয়যাত্রার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূত্রপাত।

আরম্ভ হল সাহিত্যিকের কলম থেকে রক্ত ঝরে পড়া—ঝরে পড়তে লাগল পতিতের জন্য দুঃখের জল। যে বারাঙ্গনাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হত প্রস্তরমূর্তি, তারও বুকের মধ্যে মাতৃরূপ খুঁজে বার করা হল, জেল-খাটা কয়েদির অন্তরে সন্ধান করা হল মন-ভাঙা কান্নার, শতগ্রন্থির ধূলিরাশির মধ্যে কোথায় অণুপরিমাণ মানবতার বেদিকায় লুকিয়েছিল, তা আবিষ্কার করা হল—আবিষ্কার করা হল অপরাধের মানসপীঠ সদ্ভাবের স্বরূপকে।

এই কাজ করার জন্য সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ চিরাচরিত পথ ছেড়ে অপথে সরাতে যাওয়া হল। এই অচেনা পথে আনাগোনার ফলে সাহিত্যের ক্ষতিও কিছু কম হল না—অশ্লীল অপাঠ্য সাহিত্যে ছেয়ে গেল বইয়ের বাজার, বহু প্রতিভা জীবনসমুদ্র মন্থন করে কেবল শুধু বিষ আহরণ করতে লাগল—বীণাপাণি নীলকণ্ঠ হলেন। কিন্তু শিবের মত বিষ জীর্ণ করার শক্তি ছিল না বীণাপাণির, তাই তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য, তাঁকে নির্বিষ করার জন্য প্রচেষ্টা হল দেশে দেশে সরকারী আইনের মারফতে। ফলে নোংরা সাহিত্য সদর বাজার ছেড়ে চোরা বাজারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। শুধু সরকারই নয় জনসাধারণের অধিকাংশও বর্জন করল নোংরা সাহিত্যকে। যা নোংরা,

তা চিরকাল কিছু সময়ে থাকতে পারে না—কালের অন্ধকারে তাকে লুকাতেই হয়। উদয় উদ্ভাস যখন রাজপথে এসে দাপাদাপি আরম্ভ করে, তখন জন-সাধারণ তাকে নিয়ে কিছুকাল সত্য স্ফূর্তি করে। কিন্তু সে স্ফূর্তির আয়ু ঐ কিছুকালই। শীঘ্রই জনসাধারণের সম্বিৎ ফিরে আসে, উদ্ভাসের ক্রিয়াকলাপ তাদের কাছে বীভৎস ও নোংরা ঠেকে, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে তারা, হয়ত বা নিজেদের ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির লজ্জা ঢাকবার জন্যই উদ্ভাসকে উত্তম-মধ্যম-সহযোগে দূরীভূত করে দিয়ে একেবারে ছবির ব্যাখ্যা করতে বসে।

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেও তাই ঘটল। নোংরা সাহিত্য স্থায়ী আসর জমাতে পারল না। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত বিপ্লবী সাহিত্যস্রষ্টা নোতুনের সন্ধানে অপথে রথচালনা করেছিলেন, তাঁরা এমন সমস্ত রত্ন আহরণ করতে সমর্থ হলেন যে, সেগুলির দ্যুতিতে ঝকমকিয়ে উঠল সাহিত্যজগৎ। এই শতদলের পত্ররাজিই হল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ ছোট গল্পের প্রাণবস্তু। অদ্যাবধি যে সমস্ত ছোটগল্প-শিল্পীরা এই সম্পদ আহরণ করে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মপাসাঁ, ডস্টয়েভস্কি, চেখভ, টলস্টয়, আইকেন, হব্যার্ড, সিন্‌ক্লেয়ার লুই, হেমিংওয়ে, বেলজাক, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি অবিস্মরণীয়। এঁদের পাশাপাশি ও কাছাকাছি বিভিন্ন দেশের বহু ছোটগল্প-শিল্পীরা নিজ নিজ অসাধারণতার দাবিতে স্থায়ী আসন সংগ্রহ করে নিয়েছেন। মনে হয়, আরও দীর্ঘকাল ধরে ছোটগল্পের প্রধান লক্ষ্য হবে বিষবৃক্ষের মধ্যে সঞ্জীবনীকণাসমূহের সন্ধান। তাই হোক—বাধার পৃথিবীতে, দুঃখের পৃথিবীতে মরণের পৃথিবীতে, সুগম সানন্দ সতেজ জীবনের বার্তা প্রচারিত হোক কৃতী ছোটগল্প-শিল্পীদের সার্থক তুলির বলিষ্ঠ টানে টানে।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে শ্রীযুক্ত গোলোকেন্দু ঘোষ চারটি বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রুশ ছোটগল্পের অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে যদি স্থান ও পাত্রপাত্রীর নাম-গুলির বাংলা করে দেওয়া হত, তাহলে বোঝা কঠিন হত যে এগুলি মৌলিক বাংলা গল্প নয়। অনুবাদকের পক্ষে এ বড় কৃতিত্বের পরিচায়ক। সার্থক লেখক গোলোকেন্দুবাবু—তাঁর ভাষা সুপাঠ্য ও প্রাঞ্জল, অনুবাদ মূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি অথচ বাঙালী পাঠকের মনের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছে। আশা করি, তিনি আরও বিদেশী গল্প অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবেন।

এবার অনূদিত গল্প চারটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

পুশকিন: (১৭৯৯-১৮৩৭) ইনিই ছিলেন জারাধীন রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন জারবিরোধী, তাঁর কাছেই ছিল তরুণ বিদ্রোহীর দল। তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে এই বিদ্রোহের সুর ফুটে উঠেছে। কিন্তু কোন জীবনদর্শন তাঁর অন্তরে স্থায়ীভাবে দানা বেঁধে ওঠার অবকাশ পায়নি। এর কারণ বোধহয় তাঁর abstract কবি-মন। কোন বস্তুকে তিনি একই ভাবে দুবার দেখতেন না, প্রতি দর্শনেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হত। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর সকল দৃষ্টিপাতকেই রূঢ়তাসংকুল করে তুলেছিল। কিন্তু সে রূঢ়তাতে বায়রন-এর তীব্র জ্বালা নেই, শেলীর আকুল আর্তনাদ নেই, ক্যুপিয়র ক্ষোভ নেই; আছে ব্রাউনিং-এর মত সত্যদর্শন এবং নিছক সুচারু ironic juxtaposition। তাঁর কবিতা যেন গদ্যধর্মী পদ্য।

যে ক'টি ছোটগল্প পুশকিন লিখেছেন, সেগুলিতেও তাঁর কবিতার লিখনরীতি অনুসৃত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে অনূদিত 'ইসকাপনের বিবি' তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প। এ গল্পের ভঙ্গী যেন মানুষের আত্মঘাতী লোভশক্তির বিরুদ্ধে এবং মানুষের অবচেতন মনে লুক্কায়িত শক্তির বিরুদ্ধে ভ্রূকুটি করে। হারম্যান জুয়ার আড্ডায় বসে থাকে, কিন্তু খেলে না। তার বন্ধুরা নিজেদের ভাবী দুর্ভাগ্যের ঠাওরায়, তাই হারম্যানকে ভাবে বোকা। আবার হারম্যানও বলে: "খুব মজা পাই খেলায়...সে আমার না" (পৃঃ ১)। অথচ, সেই হারম্যানের মনে মনে ভারী ইচ্ছা, কোন রকমে কেবলমাত্র শুভক্ষণ নিয়ে জুয়া খেলে। তাই সে কাউন্টেসের কাছে শিখল যে মন্ত্র, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলতে বসে গুলিয়ে ফেলে সর্বনাশ হল—পাগল হয়ে থেকে গেল। পুশকিন ভাগ্যের বিরুদ্ধে,

মানুষের দুর্বলতা ও অপরাধের দিকে আলোকপাত করেছেন এ গল্পে,—কিন্তু লেখকের মত নাকসিঁটকানো ধিক্কার করে নয়, করেছেন দরদ-মাখানো ভাবে নিনাভেচ্কার চরিত্র সৃষ্টি করে। এ গল্পে নিনাভেচ্কাই দুঃখীদের প্রতিনিধি, আর হাবভাবের কপালের ভ্রূকুটি হল লেখকের ভ্রূকুটি, অবাঞ্ছিতের দিকে। নিনাভেচ্কার চরিত্রটি সম্পূর্ণ লিরিক—সে যেন "শুভক্ষণ"-কবিতার ("ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে") নায়িকা।

ডস্টয়েভ্‌স্কি : (১৮২১-৮১) রুশ-সাহিত্যে ডস্টয়েভ্‌স্কি এক বিস্ময়কর নাম, তা একজন কমিউনিস্ট কর্তা যতই কেন না তাঁর মরণোত্তর অস্তিত্বকে অস্বীকার করুন। গোগোল, টলস্টয়, গোর্কি, টুর্গেনিভ্‌ ও গল্পকারদের সঙ্গেই একত্রে তাঁর নাম উচ্চারিত হবে। তাঁর সাহিত্যের পাত্রপাত্রীরা সমাজের নিচের তলার লোক। এদের মধ্যেও যে মানবতা পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান, এরাও যে সৎ হতেই চেয়েছে এবং কেবল অবস্থাবিপর্যয়েই অপকর্ম করে, তা প্রমাণ করার জন্য তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এ যুক্তি নৈয়ায়িকের যুক্তি নয়—এ যুক্তি দরদী মনের। অপরাধীকে তিনি খর্ব করেছেন বিন্দুদের শরণাপন্ন হয়ে—মানুষের অন্তরে যে ঈশ্বরপ্রেরিত আত্মা, সে নারকী হবে কোন্ অনুশাসনে? তাঁর বিখ্যাত গল্প 'সৎ চোর'-এর এমিলিয়ানোভিচের স্বীকৃতি পাঠকসাধারণের মন থেকে তার প্রতি সকল বিরাগ মুহূর্তে দূর করে দেয়—মুহূর্তেই কুজ্ঝটিকার অন্ধকার ভেদ করে অপপ্রকাশিত হয় তৃতীয়ার চাঁদ। শুধু দরদী ডস্টয়েভ্‌স্কি-ই নয়, পাঠকের অন্তরাত্মাও সৎ চোরের জন্য কেঁদে ওঠে।

মনস্তত্ত্বে ডস্টয়েভ্‌স্কির ছিল গভীর জ্ঞান। তিনি জানতেন: কি তুচ্ছ, কি খুঁটিনাটি ব্যাপার গভীর হয়ে বাজে মানুষের বুকে। তাই তাঁর এমিলিয়ানোভিচ মদ খেয়ে পোশাক বেচতে পারে, অনাহারে অর্ধাহারে শুকাতে পারে, ছিন্নবসনে ফ্ল্যাটের সিঁড়ির উপর শুয়ে রাত কাটাতে পারে, কিন্তু পারে না আশ্রয়দাতার সন্দেহ সইতে। আস্তাফি যেই তাকে চোর বলে সন্দেহ করতে লাগল এবং বাইরে যাবার আগে তোরঙ্গে চাবি লাগাতে লাগল, অমনি তার অন্তরের ভিত্তিমূল প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেল—সে নিজেকে খাড়া রাখতে পারল না, নিজেই দুহাত বাড়িয়ে ডেকে নিয়ে এল নিজের মরণকে। তার এ আত্মহনন অভিমান-প্রসূত। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর রাইচরণও অভিমানের বশে আপন জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। কিন্তু রাইচরণের অভিমান

গল্পের মূলের অভিপ্রায়, আর এভিনিয়াকোভিচার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত—এতে আছে অধ্যাপিকের হাততালি। আর তাই বুঝি মাইকেলের চেয়েও এভিনিয়াকোভিচা আমাদের এত আকৃষ্ট করে। ভটরত্নকির এ গল্পটির তুলনা নেই। এর অনেক পরে লেখা জনাথন আইভেন-এর 'চোর' গল্পটি খ্যাতি অর্জন করলেও এর নাগাল পায়নি।

চেখভ : (১৮৬০-১৯০৪) বিশ্বসাহিত্যে ছোট-গল্পকাররূপে চেখভের তুলনা নেই। কত অল্প পরিসরে সার্থক ছোটগল্প লেখা যায়, তা যাঁরা চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মপাসাঁ ছাড়া আর বোধহয় কেউই চেখভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এদিক থেকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ আসন ত পেয়েছেনই, বনফুলও পাবার হকদার। মপাসাঁর গল্পের প্রধান বস্তু হল stunt, কিন্তু চেখভ stunt বাদ দিয়েই মনোত্তীর্ণ গল্প লিখেছেন এবং তাঁর বহু গল্পই মপাসাঁকে ছাপিয়ে গেছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রদত্ত 'প্রিয়া' গল্পটি ঐ ছাপিয়ে যাওয়া গল্পগুলিরই অন্যতম।

অদ্ভুত গল্প 'প্রিয়া', অদ্ভুত তার নায়িকা ওলেংকা। যখনই যাকে সে কাছে পায়, তখনই তাকে সে ভালোবাসে। প্রতিবারই এমনভাবে সে ভালোবাসে, যেন মনে হয়, আর কাউকে সে কখনও ভালোবাসেনি—ভালোবাসবেও না কোনদিন। সোজা কথায়, জনসাধারণের খাঁটি ভাষায় সে পাকা 'নেকি'! কিন্তু দরদী চেখভ জনসাধারণের সঙ্গে একই তক্তাপোশে বসে ওলেংকার উদ্দেশে মুখ ভেংচিয়ে 'নেকি' শব্দটি উচ্চারণ করতে নারাজ, তিনি ঢুকলেন ওলেংকার অন্তরে। গল্প লিখলেন তিনি জনসাধারণের জন্য নয়, লিখলেন ওলেংকার জন্য। ওলেংকার মনের মধ্যে যে চিরন্তনী নারী ভালোবাসার পাত্র আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার আচরণ লোকচক্ষে হাস্যকর হতে পারে, কিন্তু শিল্পীর দরদ সে পাবেই। প্রকৃতি যখন জনপদের অস্থির বেগে ওঠে, তখন ছোট ছোট জন্তু তাকে উপহাস করতে পারে, কিন্তু জনগণও কি তাই করে? শিল্পীও মহাকবের মত দুর্গতকে বুকে টেনে নেয়। এই দরদী মনের ছোঁয়া পেয়েই, stunt-এর জৌলুস না থাকা সত্ত্বেও 'প্রিয়া' গল্পটি তথা তার নায়িকা ওলেংকা এত মনোরম হয়ে উঠেছে।

টলস্টয় : (১৮২৮-১৯১০) উপন্যাসে হুগোর যে স্থান, ছোটগল্পে টলস্টয়েরও সেই স্থান, বোধহয় আরও উর্ধ্বে। আমাদের কাছে টলস্টয়ের

গল্পগুলি নেহাতই fable-ধরনের নীতিগল্প হয়ে যেত। কিন্তু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে মূল্য, ছোটগল্পে টলস্টয়েরও সেই—দুজনেই সাহিত্যের শাশ্বত কবি।

টলস্টয়ের প্রতি গল্পই খোলাখুলিভাবেই শিক্ষামূলক, অথচ প্রতিটি গল্পই পুরোপুরিভাবে রসোত্তীর্ণ গল্প। এ হল অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব, কারণ একাধারে গল্পের রস ও উপদেশ মিশিয়ে দেওয়া আর সোনার পাথরবাটি তৈরি করা প্রায় একই কথা। কিন্তু এই অসাধ্যসাধনও করেছেন টলস্টয়। তাই সর্বকালের ছোটগল্প-লিখিয়েদের তালিকায় তাঁর নাম শীর্ষভাগেই থাকবে।

বর্তমান গ্রন্থে প্রথম 'কি লাভ এতে' গল্পটি একদিকে যেমন মানুষের লোভের ভয়ংকর পরিণাম সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে চিরকালীন উপদেশটি নোতুন করে পরিবেশন করছে, অন্যদিকে তেমনি গল্পের নায়ক পাখমের প্রতি পদক্ষেপে তার মনটিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করছে। একদিকে হিতোপদেশ, অন্যদিকে মনস্তত্ত্ব, আর এই দুইয়ে মিলে সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ অনবদ্য একটি গল্প,—এর তুলনা নেই, এ কেবল টলস্টয়ের পক্ষেই সম্ভব।

গোলোকবাবু আলোচিত গল্প ক'টি অনুবাদ করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আবার অনুরোধ করি, তিনি আরও অনুবাদ করুন, করুন আরও আরও।

সূচীপত্র

ইশকাপনের বিবি

১

সামরিক অশ্ব-বাহিনীর নরউমভের এক ঘরে তাসুড়েদের এক আড্ডা বসেছিল। শীতের দীর্ঘ রাত বেমালুম কাটিয়ে দিয়ে নৈশভোজে তারা যখন বসল, তখন সকাল পাঁচটা। যারা জিতল তারা গোগ্রাসে গিলল আর অন্যরা অন্যমনস্কভাবে তাদের ডিসের দিকে তাকিয়ে রইল। যা হোক, শ্যাম্পেন আসতে সবাই সচেতন হয়ে উঠে আলোচনায় মুখর হ'ল।

"সন্ধেবেলাটা কেমন কাটল, সুরিন?" সরাইওলা জিজ্ঞেস করল।

"যাঃ, হেরে গেলুম, যেমন বরাবর যাই। বলতেই হবে, আমার কপালটা বড় খারাপ। আমি 'মিরাণ্ডোল' খেলি, কখনো চড়া বাজি ধরি না; মাথা ঠাণ্ডা রাখি, কিছুতেই চটি না; তবু সব সময়েই হেরে যাই।"

"আর তুমি একবারও লাল ধর না। সত্যিই, তোমার গোঁড়ামিতে অবাক হয়ে যাই।"

"কিন্তু হারম্যান সম্বন্ধে তুমি কি ভাবছ?" এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সম্পর্কে এক অতিথি জিজ্ঞেস করল। "জীবনে সে কখনো তাস ছুঁল না, কখনো বাজি ধরল না, তবু সকাল পাঁচটা পর্যন্ত ঠায় বসে বসে খেলা লক্ষ্য করা চাই।"

হারম্যান বললে, "খুব মজা পাই খেলায়, তা বলে কালতু লাভের আশায় দরকারীটা বিসর্জন দেবার মতো অবস্থা তো আমার নয়।"

"হারম্যান মিতব্যয়ী এবং জার্মান—এই হ'ল সোজা কথা। কিন্তু আমার জানা এমন একজন আছেন, যাঁকে আমি কিছুতেই

বুঝতে পারি না; তিনি হলেন আমার ঠাকুমা কাউন্টেস এ্যানা ফেডোটোভনা।" টমস্কি বলল।

"ব্যাপারটা কি?" অতিথিরা জানতে চাইল।

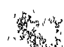
টমস্কি বলতে লাগল, "আমি বুঝতে পারি না, কেন যে আমার ঠাকুমা কখনো জুয়া খেলেন না।"

"আশি বছরের বুড়ির জুয়া না খেলার মধ্যে কী আর আশ্চর্য থাকতে পারে?" নরউমভ হেসে বলল।

"তা হলে তুমি সমস্ত বিষয়টা জান না।"

"না, সত্যিই বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।"

"তা হলে শোন। ষাট বছর আগে ঠাকুমা একবার প্যারিস-এ গিয়ে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন। লোকেরা শুধু একবার 'মস্কোর ভীনাস'কে চোখে দেখবার জন্যে ছুটোছুটি করত। ওই নামে তারা ডাকত তাঁকে। রিসলু ঠাকুমার সঙ্গে প্রেম করল। ঠাকুমা বলতেন যে তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্যে রিসলু নিজেকে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল আর কি। মহিলারা সে সময় 'ফারো' খেলত। এক আড্ডায় একবার অরলিয়নের ডিউকের কাছে একটা বড় রকমের টাকা ঠাকুমা হারলেন। বাড়ি ফিরে এসে মুখ থেকে ঘোমটা নামিয়ে ঘাঘরা খুলে ফেলে ঠাকুর্দাকে তিনি জুয়ায় হেরে যাওয়ার কথা জানিয়ে টাকাটা দিয়ে দেবার হুকুম করলেন। যতটা মনে পড়ে, আমার স্বর্গত ঠাকুর্দা, ঠাকুমার কাছে এক ধরনের বাড়ির বাবুর্চির মতো ছিলেন। ঠাকুমাকে আগুনের মতো ভয় করতেন তিনি, কিন্তু অত মোটা টাকা হেরে যাওয়ার কথা শুনে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল। ঠাকুমা নানান জায়গায় যত টাকা হেরেছেন, তার একটা হিসেব দাখিল ক'রে জানিয়ে দিলেন যে ছ'মাসে তিনি আধ-লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক উড়িয়েছেন, এবং প্যারিস-এ তাঁদের মস্কো বা সারাটোভ-এর জমিদারি নেই। অবশেষে বেঁকে বসলেন এবং জুয়োর টাকা শোধ করতে পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। ঠাকুমা



তাঁর গালে একটা চড় মেরে চটে যাওয়ার লক্ষণ হিসেবে একা একা শুতে গেলেন।

"পরের দিন এই বয়োরা শান্তিকে কম করবে আশা ক'রে ঠাকুর্দাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি রাজী হলেন না। জীবনে এই প্রথম তাঁরা তর্ক করলেন। ঠাকুমা তাঁকে শান্ত করবেন ভেবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যে, ধার তো থাকবেই—কোচোয়ান আর যুবরাজের বিরাট পার্থক্য তো এইখানেই।

"কিন্তু সবই ব্যর্থ হ'ল, ঠাকুর্দা গোঁ ধরে রইলেন। ব্যাপারটা এখানেই চুকল না। ঠাকুমা ভেবে পেলেন না, কি করবেন। কিছু দিন আগে বিশিষ্ট একজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তোমরা হয় তো কাউন্ট সেন্ট জার্মেন-এর কথা শুনে থাকবে। তার সম্পর্কে বহু আশ্চর্য গল্প চলিত আছে। তোমরা জান, তাকে মনে করা হ'ত এক ধরনের ভবঘুরে ইহুদি, অমৃত ও পরশমণির আবিষ্কারক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

"অনেকে তাকে ওঝা বলে ঠাট্টা করত; কিন্তু ক্যাসানোভা আত্মচরিতে বলে গেছে, ও ছিল গুপ্তচর। যাই হোক, সেন্ট জার্মেন রহস্যময় হলেও মানুষকে খুবই মুগ্ধ করতে পারত, সেরা অভিজাত মহল তাকে খুঁজে বেড়াত। এমনকি আজও ঠাকুমা ধর্মের সঙ্গে তার স্মৃতি ধরে রেখেছেন এবং তার সম্বন্ধে কেউ অসম্মানের সঙ্গে কথা বললে ঠাকুমা অসন্তুষ্ট হন।

"আমার ঠাকুমা জানতেন যে, সেন্ট জার্মেনের হাতে সব সময়ে মোটা টাকা থাকত। তার শরণাপন্ন হবেন ভেবে শীগ্‌গির তাকে আসতে লিখে দিলেন ঠাকুমা।

"অদ্ভুত!—বুড়ো লোকটা তখুনি এসে দেখল ঠাকুমা দুঃখে একেবারে কাতর হয়ে আছেন। ঠাকুমা স্বামীর বর্বরতার কথা চরম ভাষায় ব্যক্ত করলেন এবং এই ঘোষণা ক'রে উপসংহার

করলেন যে, তাঁর বন্ধুতা ও সহানুভূতির ওপরেই ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করছে।

"সেন্ট জার্মেন এক মুহূর্ত ভেবে উত্তর দিল, 'ম্যাডাম, আমি আপনার টাকাটা আপনায় দিতে পারি ; কিন্তু জানি, আমার টাকাটা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আপনার শান্তি থাকবে না। তাই আপনার ওপর নতুন ক'রে আর বোঝা চাপাতে চাই না। এই ঝামেলা থেকে উদ্ধারের আর একটা পথ আছে—আপনার হেরে-যাওয়া টাকাটা আপনি জিতে নিতে পারেন।'

"ঠাকুমা জবাব দিলেন, 'কিন্তু প্রিয় কাউন্ট! আমার হাতে তো কোন টাকা নেই!'

"'টাকার দরকারও নেই। আমার কথাটা অনুগ্রহ ক'রে শুনুন।' সেন্ট জার্মেন জবাব দিল। সে তারপর একটা গোপন কৌশল বলল যার জন্যে আমরা প্রত্যেকেই অনেক-কিছু ছাড়তে রাজী হব।"

উপস্থিত সকলে এবার আরো মনোযোগ দিল। টমস্কি পাইপ জ্বালিয়ে অল্পক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে বলে চলল—

"সেই দিন সন্ধেবেলা ঠাকুমা ভার্সাই-এ গিয়ে 'কুইন্‌স্ টেবিল'এ উপস্থিত হলেন। সেখানে অরলিয়নের ডিউকের আড্ডা। একটা ছোট গল্প ফেঁদে টাকাটা শোধ দেওয়া হয়নি ব'লে আপশোষ জানালেন। তারপর খেলতে বসলেন। তিনটে তাস বেছে নিয়ে একটার পর একটা খেলতে লাগলেন। প্রত্যেকবার জেতবার সঙ্গে সঙ্গে বাজি দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে তিনবারই সোজা জিতে গেলেন। এমনি ক'রে ঠাকুমা যা টাকা হেরেছিলেন, সব টাকা শোধ করলেন।"

"ভাগ্য ছাড়া আর কিছু না!" একজন অতিথি বলল।

"চমৎকার গল্প।" হারম্যান টিপ্পনি কাটল।

"তাসগুলো বোধহয় চিহ্ন-করা ছিল।" তৃতীয়জন বলল।

"আমার তা মনে হয় না।" গভীর স্বরে টমস্কি উত্তর দিল।

নরউমভ বলল, "আশ্চর্য! তোমার এমন ঠাকুমা আছেন যিনি

পরপর তিনটে তাসেই বাজি জিততে পারেন, আর তুমি তাঁর কাছ থেকে রহস্যটা আদায় করতে পারনি ?"

টমস্কি জবাব দিল, "ওইখানেই তো গোল। ঠাকুমার চার ছেলে, তার মধ্যে একজন আমার বাবা। চারজনেই পাকা জুয়াড়ী, তবু একজনের কাছেও ঠাকুমা কৌশলটা বলেননি। বললে অবশ্য তাদের পক্ষে বা আমার পক্ষে খারাপ কিছু হ'ত না। ঘটনাটা আমি কাকা কাউন্ট আইভান ইলুইচ-এর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি নিজের দিব্যি দিয়ে বলেছিলেন যে ব্যাপারটা সত্যি।"

"চাপলিস্‌কি লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে গরীব হয়ে মারা গেল। যৌবনে একবার সে তিন লাখ রুবল হারল জোরিচ-এর কাছে, অবশ্য নামটা যদি আমার সঠিক মনে থাকে। চাপলিস্‌কি ভেঙে পড়ল এতে। ঠাকুমা সাধারণত যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতায় খুব নিষ্ঠুর হতেন, কিন্তু যাই হোক, এর বেলায় তাঁর দয়া হ'ল। ঠাকুমা তাকে তিনটে তাস দিয়ে একটার পর একটা খেলতে বললেন আর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, যতদিন বাঁচবে আর সে কখনো তাস খেলবে না।

"চাপলিস্‌কি তারপর বিজয়ী খেলোয়াড়ের কাছে গিয়ে নতুন ক'রে খেলা শুরু করল। প্রথম তাসে পঞ্চাশ হাজার রুবল ধরে জিতল, দ্বিতীয় তাসে বাজি দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে জিতল ; শেষ তাসেও জিতল ; এমনি ক'রে যা হেরেছিল তার চেয়েও বেশি জিতল।… কিন্তু এখন থাক, শুতে যাবার সময় হয়েছে—ছ'টা বাজতে আর পনর মিনিট মাত্র বাকি।"

বাস্তবিকই তখন সকাল হতে শুরু করেছে, যুবকেরা গেলাস খালি ক'রে পরস্পর বিদায় নিল।

বৃদ্ধা কাউন্টেস এ্যানা ফেদোটোভনা ড্রেসিং-রুমের আরশির সামনে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে তিনজন আয়া। একজন ধরে রয়েছে রুজের একটি ছোট পাত্র, আরেকজন মাথার কাঁটার একটি বাক্স এবং অপরজন উজ্জ্বল লাল ফিতে-লাগান একটা লম্বা টুপি। তিনি যে এখনো সুন্দরী সে দাবী কাউন্টেসের আর বিন্দুমাত্র নেই, কিন্তু তখনো তিনি যৌবনের অভ্যাসকে আঁকড়ে রেখেছেন। ষাট বছর আগের ফ্যাশান অনুযায়ী দীর্ঘ সময় সজ্জা ঠিক আগের মতই নিখুঁতভাবে করতেন। জানালার ধারে বসে এম্ব্রয়ডারী করার ফ্রেম হাতে তাঁর এক তরুণী সঙ্গিনী।

"সুপ্রভাত ঠাকুমা, সুপ্রভাত শ্রীমতী লিজা!" বলে এক যুবক অফিসার ঘরে প্রবেশ করল। "ঠাকুমা, কিছু চাইতে এসেছি তোমার কাছে।"

"কি সেটা, পল্?"

"আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, আর চাই শুক্রবার দিন নাচে তাকে সঙ্গে আনতে।"

"নাচে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিও; কালকে প্রিন্সেস-এর ওখানে গেছলে?"

"হ্যাঁ, সবই ভাল লাগল; সকাল পাঁচটা পর্যন্ত নাচ চলল। ইলেৎস্কায়া অপরূপ!"

"অপরূপ হওয়ার কি আছে তার? সে কি তার ঠাকুমা প্রিন্সেস ডারিয়া পেট্রোভনার মতো নয়? অবশ্য প্রিন্সেস ডারিয়া পেট্রোভনা এখন খুবই বুড়ি হয়ে গেছেন।"

"বুড়ি হয়ে গেছেন—কি বলছ তুমি?" টমস্কি অন্যমনস্কভাবে বলে ফেলল, "সাত বছর আগেই তো তিনি মারা গেছেন।"

তরুণী মহিলাটি মাথা তুলে ইশারা করল। তখন তার মনে পড়ল—কাউন্টেসকে সমসাময়িকদের কারুর মৃত্যু-সংবাদটা জানান ঠিক হয়নি, সে ঠোঁট কামড়াল। কিন্তু কাউন্টেস একান্ত উদাসীনভাবে খবরটা শুনলেন।

"মারা গেছে!" তিনি বললেন, "আমি তো কিছু জানি না, আমরা একই সময়ে 'মেড্-অফ্-অনার' নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং যখন সম্রাজ্ঞীর সামনে উপস্থিত হই"—এই বলে তাঁর এক প্রিয় গল্প, এই নিয়ে একশ'বার, আওড়ে চললেন।

"এসো পল্," তাঁর গল্প শেষ ক'রে বললেন, "আমাকে একটু ধর, উঠি। লিজাঙ্কা, আমার নস্তির কৌটটা কোথায়?"

কাউন্টেস তিনজন আয়া নিয়ে সজ্জা নিখুঁত করতে পর্দার আড়ালে গেলেন। টমস্কি একা তরুণীর সঙ্গে রয়ে গেল।

"কাউন্টেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাও, ভদ্রলোকটি কে? লিজাভেটা চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল।

"নরউমভ, চেন তাকে?"

"না। সে সামরিক না অসামরিক?"

"সামরিক।"

"সে কি ইঞ্জিনিআর-বাহিনীতে আছে?"

"না, অশ্ব-বাহিনীতে। ইঞ্জিনিআর-বাহিনীর কথা বললে কি ভেবে?"

তরুণী শুধু স্মিত হাসল। কোন উত্তর দিল না।

"পল্," পর্দার আড়াল থেকে কাউন্টেস চেঁচিয়ে বললেন, "আমাকে কিছু নতুন উপন্যাস পাঠিয়ে দিও তো, দোহাই আধুনিক ধরনের কিছু পাঠিও না।"

"তার মানে ঠাকুমা?"

"তার মানে এমন উপন্যাস হওয়া চাই যাতে নায়ক তার বাবাকে বা মাকে গলা টিপে মারে না বা যাতে ডুবে যাওয়া নেই।

ডুবে থাকা লোকদের আমার ভারি ভয় করে। ও রকম বই চাই না।"

"ও ধরনের উপন্যাস আজকাল আর নেই। কোনো রুশ উপন্যাস পড়বে?"

"রুশ উপন্যাস আছে না কি? যাই হোক, তাই আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিও।"

"বিদায়, ঠাকুমা। আমার তাড়াতাড়ি আছে। বিদায়, লিজাভেতা ইভানোভনা।"

যাবার আগে একটু দাঁড়াল। "নরউমভ ইঞ্জিনিয়ার-বাহিনীতে আছে ভাবলে কেন তুমি?" বলে টমস্কি সাজঘর থেকে চলে গেল।

লিজাভেতা কাজ ফেলে একা একা জানালার দিকে চেয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে, রাস্তার ওপারে বাড়ির কোণে এক যুবক অফিসারকে দেখা গেল। তীব্র লজ্জায় তার গালদুটো লাল হয়ে গেল; হাতে আবার ফ্রেমটা তুলে নিয়ে মাথা নিচু করল, এমন সময় পুরো সাজ-পোশাক ক'রে কাউন্টেস ফিরে এলেন।

"গাড়িটা বলে দাও, আমরা একবার বেড়াতে বেরব।" তিনি হুকুম করলেন।

লিজাভেতা ফ্রেম ছেড়ে উঠে হাতের কাজ গোছাতে লাগল।

"কি হয়েছে বাছা তোমার, কালা হ'লে না কি?" কাউন্টেস চড়া গলায় বললেন, "গাড়িটাকে এক্ষুনি তৈরি হ'তে বলে দাও।"

"এক্ষুনি যাচ্ছি আমি," তরুণীটি পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল।

প্রিন্স পল্ আলেকজান্দ্রোভিচের কাছ থেকে একটি চাকর খানকয়েক বই নিয়ে এসে রাখল।

"বোলো তাকে, আমার অনেক ধন্যবাদ।" কাউন্টেস তাকে বললেন। "লিজাভেতা, লিজাভেতা, কোথায় দৌড়চ্ছ?"

"পোশাক পরতে যাচ্ছি।"

"প্রচুর সময় আছে, বোসো, প্রথম খণ্ডটা খুলে পড়ে শোনাও।"
তাঁর সঙ্গিনী বইটি খুলে কয়েক লাইন পড়ল।

"আরো চেঁচিয়ে," কাউন্টেস বললেন, "তোমার হ'ল কি বাছা? গলা ভেঙে গেল না কি?—দাঁড়াও, ওই পা-দানিটা দাও—আর একটু কাছে, ব্যস এতেই হবে।"

লিজাভেটা দু'পাতা পড়ল। কাউন্টেস হাই তুললেন।

"বইখানা রাখো," তিনি বললেন, "যত সব বাজে ব্যাপার! প্রিন্স পল্‌কে ধন্যবাদ দিয়ে বইখানা ফেরত দিও।...কিন্তু গাড়িটা কোথায়?"

"গাড়ি তো তৈরী" রাস্তা দেখে নিয়ে লিজাভেটা বলল।

"ব্যাপার কি, তুমি এখনো পোশাক পরনি? সব সময়েই কি তোমার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? অসহ্য ব্যাপার।"

লিজাভেটা দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল। তখনো দু'মিনিট পুরো হয়নি, কাউন্টেস নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। তিনজন আয়া এক দরজায় এবং একজন খানসামা অপর দরজায় ছুটে এল।

"ব্যাপার কি, আমি তোমাদের জন্যে ঘণ্টা বাজালে শুনতে পাও না?" কাউন্টেস বললেন, "লিজাভেটা ইভানোভনাকে বলো, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি।"

লিজাভেটা টুপি আর পোশাক প'রে ফিরল।

"অবশেষে তুমি এসেছ?" কাউন্টেস বললেন, "কিন্তু এমন মনোরম সজ্জা কেন? কাকে শিকার করতে চাও? আবহাওয়া কি রকম? মনে হচ্ছে, খানিকটা ঝোড়ো।"

"না হুজুরাইন, বেশ শান্ত।" খানসামা উত্তর দিল।

"তোমার ধারণা নেই, কি বলছ। জানালাটা খোলো। ঠিকই তো; ঝোড়ো আর ভীষণ ঠাণ্ডা। ঘোড়াগুলো খুলে দাও।

লিজাভেটা, আমরা বেড়াতে যাব না, তোমার ওভাবে সাজবার কোন দরকার নেই।"

এ কেমনধারা জীবনযাত্রা।—লিজাভেটা চিন্তা করতে লাগল। সত্যিই, লিজাভেটা বড় অভাগী। দান্তে বলেছেন, 'আগন্তুকের আহার তিক্ত আর তার সিঁড়ি কষ্টসাপেক্ষ।' কিন্তু কে জানে, এক অভাগী পার্শ্বচরের পক্ষে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার উপর নির্ভরতা কতটা তিক্ত। কাউন্টেস হৃদয়হীন নন্, কিন্তু সামাজিক পরিবেশ তাঁকে খেয়ালী করে দিয়েছে। এবং তিনি তাদের মতোই লোভী ও অহংকারী, যারা সেরা দিনগুলো কাটিয়ে বুড়ো হয়েছে ও যাদের চিন্তা বর্তমানে নয়, অতীতে পড়ে থাকে। বিরাট বিশ্বের সমস্ত দম্ভ-বিলাসিতায় তিনি যোগ দিতেন। নাচে গিয়ে এক কোণে বসতেন প্রাচীন অলঙ্কারের মতো, পুরোনো রীতি অনুযায়ী পোশাক ও সজ্জা, নাচঘরের অপরিহার্য অলঙ্কার যেন। সমস্ত অতিথিরা ঘরে প্রবেশ ক'রে উৎসবের রীতি অনুযায়ী এক দীর্ঘ অভিবাদন জানাত, কিন্তু তারপর আর কোন মনোযোগ দিত না। তিনি বাড়িতে সারা শহরকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং নিখুঁত আদবকায়দা পালন করতেন যদিও অনেকের মুখও তিনি চিনতে পারতেন না। তাঁর নানা গৃহপালিতের দল, সাজঘরে ও চাকরদের ঘরে বুড়ো হয়েছে এবং অত্যন্ত নগ্নভাবে তাঁকে ঠকানর ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেছে।

লিজাভেটা ইভানোভনা ছিল বাড়ির শহিদ। যখন চা পরিবেশন করত, বেশি চিনি দেওয়ার দরুন বকুনি খেত সে। কাউন্টেসকে যখন কিছু পড়ে শোনাত, লেখকের দোষ তার ঘাড়ে চাপত; কাউন্টেসের ভ্রমণে সে যখন সঙ্গী হ'ত, আবহাওয়ার জন্যে বা রাস্তা খারাপ হওয়ার জন্যে দায়ী হ'ত সে। তার পদের জন্যে একটা মাইনে নির্ধারিত ছিল বটে, কিন্তু কদাপি তার হাতে আসত সেটা; অথচ তার কর্তব্য ছিল আর সকলের মত পোশাক পরা, অর্থাৎ যে ধরনের পোশাক মুষ্টিমেয় লোকেই পরতে পারত।

সমাজে তার অবস্থা ছিল করুণাজনক। সবাই চিনত তাকে কিন্তু কেউই তার প্রতি মন দিত না। 'বল' নাচে সে যোগ দিত শুধু যখন কারোর সঙ্গীর অভাব ঘটত; কোন মহিলা তার বাহু ধরতেন যখন তাঁকে সাজঘরে বেশবিন্যাসের জন্যে নিয়ে যেতে হ'ত।

অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল সে এবং নিজের অবস্থা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করত; অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করত কোন মুক্তিদাতা এসে তাকে নিস্তার দিক। কিন্তু যুবকেরা তাদের হ্যাবলামিভরা চরিত্রে খুব কম মনোযোগের সঙ্গে তাকে সম্মান ক'রে চলত, যদিও তারা যে-সব নির্লজ্জ এবং হৃদয়হীনা বিবাহযোগ্যা তরুণীদের ঘিরে গুঞ্জন করত, তাদের চেয়ে শতগুণে সুন্দরী ছিল সে।

বহুবার সে চোখ-ঝলসান ক্লান্তিকর নাচঘর থেকে নীরবে নিজের ছোট্ট ঘরে কাঁদতে চলে এসেছে। তার ঘরে ছিল শুধু একটা আলমারি, একটা আয়না এবং একটা রঙ-করা পালঙ্ক। এক কোণে একটা তামার বাতিদানে একটা চর্বির বাতি মিটমিটিয়ে জ্বলত।

গল্পের শুরুতে বলা সান্ধ্য-বৈঠকের দু'দিন পরে এবং এই ঘটনা ঘটার এক সপ্তাহ আগে—একদিন সকালবেলায় এমব্রয়ডারির ফ্রেম হাতে লিজাভেটা জানালার ধারে বসে ছিল। হঠাৎ বাইরে তাকাতে তার চোখ পড়ল ইঞ্জিনিয়ার্সের এক তরুণ অফিসারের ওপর—জানালার দিকে দৃষ্টি রেখে একভাবে সে দাঁড়িয়ে। লিজাভেটা মাথা নিচু ক'রে কাজে মন দিল। মিনিট-পাঁচেক পরে আবার তাকাতে দেখে, অফিসারটি তখনো একভাবে দাঁড়িয়ে।

অফিসারদের সঙ্গে রঙ্গরসে অভ্যস্ত নয় বলে, আর রাস্তার দিকে তাকাল না। কয়েক ঘণ্টা ধরে মাথা না তুলে সূচের কাজ ক'রেই চলল সে।

মধ্যাহ্ন-ভোজ তৈরি খবর পাবার পর সে এমব্রয়ডারির কাজ রাখতে উঠল। কিন্তু এমনি একবার জানালার বাইরে চোখ পড়তে

টের পেল অফিসার তখনো সেখানে আছে। ব্যাপারটা তার ভারি অদ্ভুত ঠেকল। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর কেমন একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে জানালার ধারে গেল; কিন্তু অফিসারটি তখন আর সেখানে নেই, দেখতে পেল না; সেও আর তার কথা ভাবল না।

কয়েক দিন পরে, কাউন্টেসের সঙ্গে যাবার জন্যে গাড়ির পা-দানিতে উঠতে যাবে, লিজাভেটার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'ল। দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে, লোমওয়ালা কোটের কলারে অর্ধেকটা মুখ লুকান, কিন্তু টুপির নিচে কালো চোখদু'টো জ্বলছিল। লিজাভেটা আশঙ্কিত হ'ল—কী এক অজানা কারণে গাড়িতে বসে কাঁপতে লাগল।

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি জানালার ধারে গেল, দেখল, অফিসার অভ্যস্ত জায়গায় তার দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে দাঁড়িয়ে। সে পিছিয়ে এল। কৌতূহল পেয়ে বসেছে তাকে, কেমন চাঞ্চল্য বোধ করতে লাগল, যা এর আগে সে কখনো করেনি, সম্পূর্ণ নতুন।

সেই থেকে একদিনও বাদ যেত না, যেদিন তরুণ অফিসারটি জানালার নিচে যথাসময়ে এসে হাজির না হ'ত। তাদের মধ্যে একরকম পারস্পরিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। লিজাভেটা নিজের জায়গাতে বসে অফিসারের উপস্থিতি অনুভব করতে পারত। মাথা তুলে প্রতিদিনই তাকে দেখার সময়টা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে লাগল। তরুণটিকে কৃতজ্ঞ মনে হ'ত, লিজাভেটা লক্ষ্য করত। কেমন ওই তরুণের চোখদু'টিতে তার চোখ পড়তেই ওর ফ্যাকাসে গালদু'টোতে একঝলক লজ্জা বয়ে যেত। এক সপ্তাহ পরে লিজাভেটা তাকে স্মিত হাসিতে বরণ করতে শুরু করল।

ঠাকুমার কাছ থেকে টমস্কি যখন এক বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেবার অনুমতি চাইছিল এই তরুণীটির বুক তখন দুরুদুরু কাঁপছিল। কিন্তু নারুমভ ইঞ্জিনিয়ার্সের নয় শুনে লিজাভেটা না-ভেবে-চিন্তে প্রশ্ন করার জন্যে আপসোস করতে লাগল, বুঝি অজান্তে টমস্কিকে তার গুপ্তরহস্য ব্যক্ত করে ফেলেছে।

হারম্যান এক জনবাসী জার্মানের সন্তান। বাবার কাছ থেকে যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সে পেয়েছে তা সামান্যই। কিন্তু নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সে দৃঢ়-সংকল্প। পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের এক কপর্দকও স্পর্শ করত না, নিজের বেতনের ওপর চলত আর বিলাসিতার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিত না। সে ছিল চাপা আর উচ্চাভিলাষী, সঙ্গীরা তার খরচে আমোদ করার সুযোগ কচিৎ হয়ত পেত। তার ছিল প্রবল ঝোঁক আর আকুল আসক্তি, কিন্তু তার চরিত্রের দৃঢ়তা অন্যান্য তরুণের মত ভুল করার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল। তাই মনেপ্রাণে জুয়াড়ী হয়েও সে তাস ছুঁত না। মনে করত জুয়াখেলার মতো অবস্থা তার নয়, তবু রাত্রির পর রাত্রি সে খেলা দেখে চলত।

তিন তাসের গল্প তার মনে ও কল্পনায় গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছে। সারা রাত এছাড়া সে আর কিছুই ভাবতে পারল না।

'বুড়ি কাউন্টেস গোপন কৌশলটা শুধু যদি আমাকে বলে দেন!' সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল, 'তিনি যদি আমাকে শুধু তিনটে জেতবার তাসের নাম বলে দেন, তাহলে কেন একবার ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখব না? তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার পরিচিত হওয়া দরকার, তাঁর সুনজর ও বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। কিন্তু এতে অনেক সময়ের দরকার, তিনি তো সাতাশি বছরের বুড়ি। এক সপ্তাহের মধ্যে এমনকি কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মারা যেতে পারেন।…কিন্তু এমন গল্পটা সত্যিই কি সত্যি হতে পারে?…না। মিতব্যয়, সংযম ও পরিশ্রম—এই তিনটে হ'ল জেতবার তাস। এদের দ্বারাই আমার পুঁজি দ্বিগুণ করতে পারব, সাতগুণ করতে পারব এবং নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব।'

এই সব ভাবতে ভাবতে পিটার্সবার্গের এক প্রধান রাস্তায় পায়ে পায়ে গিয়ে পৌঁছল এক প্রাচীন অট্টালিকার সামনে। অনুচর ও

গাড়িঘোড়ায় রাস্তাটা ভর্তি। উজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত ফটকের সামনে একটার পর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে, তা থেকে হয়ত কোন সময়ে এক তরুণী সুন্দরীর সুঠাম চরণযুগল বেরিয়ে ফুটপাথে পড়ল, কখনো অশ্ব-বাহিনীর কোন অফিসারের ভারি বুট, কখনো-বা রাজনৈতিক জগতের কারুর সিল্কের মোজাপরা জুতো। মেয়েদের লোমওয়ালা কোট ও পুরুষদের ওভারকোট বিরাট গেটের ভেতর দিয়ে একের পর এক ব্যস্ত গতিতে প্রবেশ করতে লাগল।

হারম্যান থামল। "কার বাড়ি এটা?" কোণের চৌকিদারকে সে শুধোলো।

"কাউন্টেস এ্যানা ফেডোটোভনার বাড়ি" চৌকিদার উত্তর দিল।

হারম্যান আবার চলা শুরু করল। তিন তাসের অদ্ভুত গল্পটা আবার তার কল্পনায় আবির্ভূত হ'ল। বাড়ির সামনে এদিক থেকে ওদিক পায়চারি শুরু করল বাড়ির মালিক ও তার অদ্ভুত গোপন কৌশল সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে। অনেক রাত্রে তার ছোট বাসায় ফিরে এসে বহুক্ষণ ধরে সে ঘুমোতে পারল না; যখন তন্দ্রা এল, সে শুধু স্বপ্ন দেখতে লাগল—তাস, সবুজ টেবিল, তাড়া-তাড়া নোট, মোহরের স্তূপ। সে একটার পর একটা তাস খেলতে লাগল, প্রত্যেকটায় সোজা জিতল, তারপর মোহরে আর নোটে পকেট-গুলো ভর্তি করে নিয়ে বিদায় নিল।

পরের দিন সকালে ঘেরিয়ে উঠে কাল্পনিক সম্পদ খুইয়ে ফেলার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর শহরে বেরিয়ে আর একবার নিজেকে দেখল কাউন্টেসের বাড়ির সামনে। মনে হ'ল, কোন অজানা শক্তি ওখানে ওকে টেনে এনেছে। সে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে তাকাল। দেখল, কোন বই বা এমব্রয়ডারীর ফ্রেম থেকে একটা ঘন চুলপূর্ণ হেঁট মাথা উঁচু হ'ল। হারম্যান দেখল, এক সতেজ মূর্তি, একজোড়া কালো চোখ। সেই মুহূর্তেই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হ'ল।

৩

লিজাভেতা সবে তার টুপি ও আবরণ খুলেছে, আবার গাড়ির হুকুম দিয়ে কাউন্টেস তাকে ডেকে পাঠালেন। গাড়িটা দরজার সামনে এলো এবং তাঁরা বসবার উদ্যোগ করতে যাচ্ছেন; ঠিক সে সময় দুজন দ্বার-রক্ষী বৃদ্ধা মহিলাটিকে ভেতরে ওঠবার জন্যে সাহায্য করছিল; লিজাভেতা দেখল, তার ইঞ্জিনিয়ার গাড়ির চাকার পাশে দাঁড়িয়ে। সে তার হাত ধরতেই আঁতকে উঠল লিজাভেতা। তার উপস্থিত বুদ্ধি লোপ পাবার উপক্রম হ'ল; কিন্তু ততক্ষণে তরুণটি বিদায় নিয়েছে—এবং যাবার আগে লিজাভেতার আঙুলের ফাঁকে একখানা চিঠি বেমালুম পৌঁছে দিয়ে গেছে।

দস্তানার মধ্যে এটা লুকিয়ে ফেলল সে। সারা রাস্তায় কিছুই তার চোখে পড়ল না বা কানে পৌঁছল না। হাওয়া খেতে বেরিয়ে কাউন্টেসের এই রকম একটা অভ্যাস ছিল যে অনবরত একটার পর একটা প্রশ্ন করা, যেমন: "লোকটা কে, যে এইমাত্র আমাদের অভিবাদন জানাল? ওই পোলটার নাম কি? ওই সাইনবোর্ডে কি লেখা রয়েছে?" এবারে লিজাভেতা এমন ভাসা-ভাসা ও বেখাপ্পা উত্তর দিতে লাগল, যে কাউন্টেস চটে গেলেন।

"বাছা, তোমার হ'ল কি?" তিনি অবাক হলেন। "তোমার জ্ঞান কি লোপ পেল? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না কি বলছি, না বুঝতে পারছ না? ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনো আমি যে সজ্ঞানে কথা বলতে পারছি।"

লিজাভেতা কিছুই শুনতে পেল না। বাড়ি ফিরে দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে দস্তানা থেকে চিঠিটা বার করল। মোহর-করা ছিল না। লিজাভেতা পড়ল। চিঠিতে প্রেম নিবেদন করা। চিঠিটা সম্ভ্রমপূর্ণ কোমল এবং একটি জার্মান উপন্যাস থেকে প্রতিটি বাক্য

নকল করা। লিজাভেটা জার্মান উপন্যাসের ছিটেফোঁটাও জানত না, বক্তব্য সম্পর্কে সে খুশিই হ'ল।

এ-সব সত্বেও চিঠিটা তাকে দারুণ অস্বস্তিতে ভরিয়ে দিল। জীবনে এই প্রথম সে কোন তরুণের সঙ্গে গোপনীয় সম্পর্কে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তরুণের সাহসিকতা তাকে আতঙ্কিত করল। নিজেকে সে বিবেচনাহীন ব্যবহারের জন্ত গাল দিল, কিন্তু কি করবে বুঝতে পারল না। সে কি জানালায় বসা বন্ধ ক'রে দেবে এবং এমন উদাসীনতার ভাব দেখাবে যে তরুণ যুবকের তার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছে এইখানেই থেমে যায়? সে কি তার চিঠিটা ফিরিয়ে দেবে এবং রূঢ় ও উদাসভাবে উত্তর দেবে? এই দ্বিধায় পরামর্শ দিতে পারে এমন কোন মেয়ে বান্ধবী বা উপদেশদাতা তার নেই। অবশেষে সে উত্তর দিতে মনস্থ করল।

নিজের ছোট লেখার টেবিলে কাগজ কলম নিয়ে ভাবতে বসল। বারকয়েক লিখতে শুরু করে চিঠি ছিঁড়ে ফেলল। যেভাবেই সে শুরু করে মনে হয়, হয় অত্যন্ত কোমল নয় অত্যন্ত রূঢ়। অবশেষে কয়েক লাইন সে লিখতে পারল যাতে সে সন্তুষ্ট বোধ করল।

সে লিখল, "আমি সুনিশ্চিত যে আপনার অভিলাষ সম্ভ্রমপূর্ণ এবং কোনরূপ অবিমৃষ্যকারী ব্যবহারের দ্বারা আপনি আমাকে আঘাত দিতে চান না, কিন্তু আমাদের পরিচয় এইভাবে শুরু হ'তে পারে না। আপনার পত্র ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং বিশ্বাস করি এইরকম অনভিপ্রেত অসম্মানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার সুযোগ দ্বিতীয়বার পাব না।"

পরের দিন হারম্যানের আবির্ভাব হতেই লিজাভেটা এমব্রয়ডারি রেখে ড্রইং-রুমে গিয়ে জানালার খড়খড়ি তুলে তরুণটির সতর্কতার ওপর ভরসা করে চিঠিটা রাস্তায় ফেলে দিল।

হারম্যান দৌড়ে এসে চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে রুটির দোকানে চলে গেল। খামের মোহর ভেঙে নিজের চিঠিটা পেল এবং লিজাভেটার

উত্তর পড়ল। এই রকমই আশা করেছিল। সে বাড়ি ফিরে গেল, কফি খু কতে তার মন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তিন দিন পরে মেয়েদের টুপি-প্রস্তুতকারী এক প্রতিষ্ঠান থেকে এক উজ্জলাক্ষী তরুণী লিকাস্তেটাকে একখানা চিঠি এনে দিল। নানান সন্দেহে সে চিঠিটা খুলল, এই আশঙ্কায় যে টাকার দাবী করা হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ সে হারম্যানের হাতের লেখা বুঝতে পারল।

"তুমি ভুল করেছ," সে বলল, "চিঠিটা আমাকে লেখা নয়।"

"হ্যাঁ, ঠিক, চিঠিটা তোমারই," মেয়েটি উত্তর দিল ঈষৎ হেসে। সব তার জানা। "পড়েই দেখ না চিঠিটা!"

লিকাস্তেটা চোখ বুলিয়ে গেল, হারম্যান সাক্ষাৎ করার অনুরোধ ক'রেছে।

"অসম্ভব, এ হ'তে পারে না," সে চেঁচিয়ে উঠল এই আস্পর্ধা-জনক অনুরোধে এবং অনুরোধ করার ধরনে আতঙ্কিত হ'য়ে। "চিঠিটা কোনমতেই আমার নয়" ব'লে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলল সেটা।

মেয়েটি উত্তর দিল, "চিঠিটা যদি তোমারই না হবে, তো ছিঁড়লে কেন? যে দিয়েছিল তার কাছে এটা ফেরত দিতাম।"

এই মন্তব্যে চঞ্চল না হয়ে লিকাস্তেটা বলল, "আশা করি, ভবিষ্যতে কোন চিঠি না নিয়ে আসার মতো তুমি ভদ্র হবে এবং যে তোমাকে পাঠিয়েছে তাকে বোলো, তার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

কিন্তু হারম্যান এতেই নিবৃত্ত হবার লোক নয়। প্রত্যেক দিন লিকাস্তেটা তার কাছ থেকে নানা উপায়ে একখানা ক'রে চিঠি পেতে লাগল। সেগুলো আর জার্মান থেকে অনুবাদ করা নয়, নিজের ভাষায় কামনার তীব্র আবেগে লেখা; কল্পনার অসামঞ্জস্য যদি হয়, তার উদ্দেশ্যের অনমনীয়তার সাক্ষ্যও বহন করছিল চিঠিগুলো।

যা হোক, লিকাস্তেটা সেগুলো আর ফেরত পাঠাত না; সে

সম্মোহিত হ'তে লাগল এবং উত্তর দিতে শুরু করল। ধীরে ধীরে উত্তরগুলো দীর্ঘতর হ'ল ও তাতে কোমলতার মাত্রা বাড়ল। অবশেষে সে জানালা থেকে নিম্নলিখিত চিঠিটা ছাড়ল :

"আজ দূতাবাসে এক 'বল' নাচের আয়োজন আছে। কাউণ্টেস সেখানে যাবেন। দু'টো পর্যন্ত আমরা থাকব। তুমি আমার সঙ্গে একা দেখা পাবার একটা সুযোগ পাবে। কাউণ্টেস বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবত চাকরগুলো চলে যাবে, এবং সুইসবাসীটি ছাড়া আর কেউ থাকবে না এবং সেও সাধারণত নিজের বাড়িতে শুতে যায়। সাড়ে-এগারটার সময় এসো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসো। যদি কোন ঘরে কারুর সঙ্গে দেখা হয়, জিজ্ঞাসা কোরো, কাউণ্টেস বাড়ি আছেন কি না। উত্তর পাবে 'নেই', তখন কিন্তু আবার ফিরে যাওয়া ছাড়া তোমার কোন উপায় নেই। কিন্তু খুব সম্ভবত তোমার সঙ্গে কারুর দেখা হবে না। ঝিয়েরা সব একসঙ্গে একঘরে থাকে। প্রথম ঘরটা ছেড়ে বাঁদিকে ফিরে সোজা চলে এসে কাউণ্টেসের শোবার ঘর পাবে। শোবার ঘরে পর্দার আড়ালে দুটো দরজা দেখবে—ডানদিকের দরজা দিয়ে ক্যাবিনেট ঘরে যাওয়া যায়, সেখানে কাউণ্টেস কখনও যান না; আর বাঁদিকের দরজা দিয়ে বারান্দায় যাওয়া যায়, বারান্দার এক কোণে একটা ঘোরান সিঁড়ি দেখবে; ওইটা আমার ঘরের সিঁড়ি।"

বাঘ যেমন অস্থির, তেমনি অস্থির হয়ে হারম্যান নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল। দশটা বাজার আগেই সে কাউণ্টেসের বাড়ির সামনে উপস্থিত। সাঙ্ঘাতিক আবহাওয়া, ঝোড়ো হাওয়া তীব্র বেগে বইছে; বড় বড় টুকরোয় শিলাবৃষ্টির মতো বরফ পড়ছে; আলোগুলো মিটমিটিয়ে জ্বলছে; রাস্তাগুলো নির্জন পরিত্যক্ত; এক-আধটা বিলম্বিত আরোহীর সন্ধানে মাঝে মাঝে হতচ্ছাড়া শহিসেরা স্লেজগাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। হারম্যান শুধু একটা জ্যাকেটে আচ্ছাদিত, ঝড় বা বরফ কিছুই উপলব্ধি করল না।

অবশেষে কাউন্টেসের গাড়ি এল। হারম্যান দেখল, কালো হরিণের চামড়ার পোশাকে আচ্ছাদিত এক বৃদ্ধাকে দ্বার-রক্ষী দুজন সাহায্য করল এবং মাথায় ফুলের অলঙ্কার ও গরম পোশাকে আচ্ছাদিত লিজাভেটা তাঁকে অনুসরণ করল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বরফ পড়ার মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে গেল। দারোয়ান ফটক বন্ধ করে দিল, জানালাগুলো অন্ধকার হ'য়ে গেল।

সেই নির্জন বাড়িটার কাছাকাছি হারম্যান এদিক-ওদিক পায়চারি করতে লাগল। অবশেষে একটা বাতির নিচে দাঁড়িয়ে ঘড়িটার দিকে তাকাল। এগারটা বেজে কুড়ি মিনিট। বাতির নিচেই দাঁড়িয়ে রইল বাকি মিনিটগুলো অতিবাহিত করার অধীর আগ্রহে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। ঠিক সাড়ে-এগারটার সময় হারম্যান বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেউড়িতে এসে পৌছল। দারোয়ান ওখানে নেই। হারম্যান দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। প্রথম ঘরের দরজা খুলে দেখল, বাতির পাশে পুরোনো চেয়ারে বসে একজন চাকর ঘুমোচ্ছে। হালকা অথচ দৃঢ় পা ফেলে হারম্যান তাকে পেরিয়ে গেল। ড্রইং-রুম ও খাবার ঘর অন্ধকার, কিন্তু প্রথম ঘরের বাতি থেকে ম্লান প্রতিফলন আসছে।

হারম্যান কাউন্টেসের শোবার ঘরে প্রবেশ করল। পুরোনো প্রতিমায় সাজান এক বেদীর সামনে একটি সোনার প্রদীপ জ্বলছে। দেওয়ালগুলো চীনা সিল্কে মোড়া; পুরোনো বিবর্ণ গদিওয়ালা চেয়ার ও ডিভানগুলো একঘেয়ে ভাবে সাজান। প্যারিসের মাদাম লাব্রুনের আঁকা দুটো পোর্ট্রেট ছবি ঘরের একদিকের দেয়ালে ঝোলান। একটি ছবিতে আঁকা উজ্জ্বল সামরিক পোশাক-পরা বুকে তারকা লাগানো, স্বাস্থ্যপূর্ণ লাল মুখ চল্লিশ বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোক; অপরটিতে আঁকা এক সুন্দরী তরুণী, ঈগল পাখির ঠোঁটের মতো নাক, কপালের ওপর কয়েকটি চূর্ণকুন্তল ও চুলে গোঁজা একটি গোলাপ ফুল। প্রত্যেক কোণে চীনামাটির মেষপালিকার

মূর্তি, সেভ্রেসের কারখানায় প্রস্তুত অলঙ্কার-বহুল ঘড়ি, টুপি রাখার বাক্স, রাউলেট খেলার সরঞ্জাম, পাখা ও গত শতাব্দীর শেষভাগে যে-সব খেলনা চালু ছিল সেই-সব। হারম্যান পর্দার আড়ালে গেল। এর পেছনে লোহার ছোট একটা পালঙ্ক, ডানদিকে ক্যাবিনেটে যাবার দরজা, বাঁদিকেরটা বারান্দায় যাবার।

সে বাঁদিকেরটা খুলে দেখল লিজাভেটার ঘরে যাবার ঘুরান সিঁড়ি। কিন্তু ফিরে এসে অন্ধকার ক্যাবিনেট ঘরে প্রবেশ করল।

ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হ'তে লাগল। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। ড্রইং-রুমের ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ হ'ল, অন্যান্য ঘড়িগুলোও বেজে গেল, তারপর আবার সব চুপচাপ নিঃশব্দ। হারম্যান শান্তভাবে ঠাণ্ডা চিমনির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে স্থির হয়ে রইল। বিপজ্জনক অথচ অপরিহার্য অভিযানে দৃঢ়সঙ্কল্প অভিযানকারীর মতো তার বুকের স্পন্দন তালে তালে চলছিল। একটা বাজল, তারপর দুটো ; দূর থেকে গাড়ির চাকার শব্দ কানে এসে পৌঁছল। এক অপ্রতিরোধ্য আবেগ তাকে যেন পেয়ে বসল। গাড়িটা কাছে এসে থামল।

গাড়ি থেকে নামবার শব্দ তার কানে এল। সারা বাড়িটা ব্যস্ততায় ভরে উঠল। চাকর-বাকরেরা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু করল, গলার আওয়াজে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল, ঘরে ঘরে আলো জ্বালানো হ'ল। তিনজন প্রাচীনা আয়া শোবার ঘরে প্রবেশ করল এবং তাদের পেছনেই এলেন কাউন্টেস, জীবন্ত অপেক্ষা অধিক মৃত, এসেই আরাম-কেদারায় ডুবে পড়লেন।

হারম্যান একটু ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। লিজাভেটা তার খুব কাছ ঘেঁসে গেল এবং ঘুরান সিঁড়ি দিয়ে যাবার দ্রুত পদধ্বনি তার কানে এসে পৌঁছল। এক মুহূর্তের জন্য বিবেকের দংশনের মতো কিসে যেন হৃদয়টা উদ্বেল হ'য়ে উঠল, কিন্তু সে একান্তই মুহূর্তের, আবার আগের মতো হৃদয় কঠিন হয়ে রইল।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্টেস পোশাক খুলতে শুরু করলেন। গোলাপ ফুল বসানো টুপিটা খুলে ফেললেন এবং পরচুলটা খুলে ফেলতেই ছোট করে ছাঁটা সাদা চুল বেরিয়ে পড়ল। চারপাশে মাথার কাঁটার বৃষ্টি হল। রৌপ্যখচিত সাটিনের হলদে পোশাক তাঁর ফোলা পায়ের নিচে খসে পড়ল। তাঁর সাজসজ্জার বিরক্তিকর পদ্ধতিগুলো হারম্যান লক্ষ্য করতে লাগল। অবশেষে কাউন্টেস শুতে যাবার পোশাক ও নৈশটুপি পরলেন। তাঁর এই বয়সোপযোগী পোশাকে তাঁকে অনেক কম বীভৎস দেখাচ্ছিল।

সাধারণত সকল বয়স্ক লোকের মতো কাউন্টেস অনিদ্রায় ভুগতেন। পরিচ্ছদ খোলা হ'লে একটা আরাম-কেদারায় বসে আয়াদের তিনি বিদায় দিলেন। ওরা বাতিগুলো নিয়ে গেল, আরেকবার ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেল, শুধু বেদীর আলোটা জ্বলতে লাগল। কাউন্টেসকে দেখাচ্ছিল পাংশু, ফোলা ঠোঁটে কি যেন বিড়বিড় করছিলেন আর এদিক-ওদিক দুলছিলেন। ম্লান চোখদুটোয় প্রকাশ পাচ্ছিল মনের সম্পূর্ণ শূন্যতা। দোলায়মান শরীর দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন যান্ত্রিক, স্বাভাবিক নয়।

হঠাৎ সেই মৃতপ্রায় মুখে এক অবর্ণনীয় ভাব ফুটে উঠল। ঠোঁটের কম্পন বন্ধ হ'ল, চোখদুটো নিষ্প্রাণ হ'য়ে গেল। কাউন্টেসের সামনে দাঁড়িয়ে এক অজানা ব্যক্তি। "ভয় পাবেন না, ভগবানের দোহাই, আমাকে দেখে ভয় পাবেন না", চাপা ও পরিষ্কার গলায় লোকটি বলল। "ক্ষতি করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই, আমি শুধু একটা করুণা ভিক্ষা করতে এসেছি।"

বৃদ্ধা নীরবে তার দিকে চাইলেন, কি ও বলল, তা যেন শুনতে পাননি। হারম্যান ভাবল, তিনি হয়ত বধির, কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে পুনরাবৃত্তি করল। বৃদ্ধা কাউন্টেস আগের মতোই নীরব রইলেন।

"আপনি আমার জীবনে সুখ এনে দিতে পারেন, এতে আপনার

কোন ক্ষতিই হবে না। আমি জানি, আপনি পরের পর তিনখানা তাসের নাম বলতে পারেন যাতে—" হারম্যান থামল।

বোধ হয় ও কি চায় কাউন্টেস এবার বুঝতে পারছেন। তিনি জবাব দেবার জন্য কথা খুঁজছেন, মনে হ'ল।

"ওটা একটা ধাপ্পা", অবশেষে তিনি জবাব দিলেন, "আমি তোমায় বিশ্বাস করতে বলছি, ওটা শুধু ধাপ্পা।"

"এ ব্যাপারে ধাপ্পার তো কিছু থাকতে পারে না," হারম্যান রাগতভাবে উত্তর দিল। "চাপলিৎস্কির কথা মনে করুন, ওর হেরে-যাওয়া টাকা আপনি জিতিয়ে দিয়েছিলেন।"

স্পষ্টই বোঝা গেল, কাউন্টেস অস্বস্তি বোধ করছেন। প্রচণ্ড আবেগ গোপনই রয়ে গেল, শরীরে তার কোন সাড়া জাগাল না, আগের মতোই নিথর রইলেন তিনি।

"বাকি জেতার তিনটে তাসের নাম কি আপনি বলতে পারেন না?" হারম্যান বলে চলল। কাউন্টেসের নীরবতা সত্ত্বেও হারম্যান বলতে লাগল, "কার জন্যে আপনি এ কৌশলটা গোপন রাখছেন? আপনার নাতিদের জন্যে? তারা তো ইতিমধ্যেই ধনী, টাকার দামও তারা বোঝে না। খোরচের হাতে পড়ে তাসগুলো আপনার ব্যর্থ হবে। উত্তরাধিকার-সম্পত্তি যে রাখতে পারে না, শয়তান তার চাকর হ'লেও, অভাবে মরবে সে। আমি ওরকম প্রকৃতির লোক নই। আপনার তিনখানা তাসের অমর্যাদা আমার দ্বারা হবে না। বলুন।

তাঁর উত্তরের আশায় ও থামল। কাউন্টেস নীরবই রইলেন। হারম্যান নতজানু হ'ল।

"আপনার হৃদয় যদি কখনো ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে থাকে, এর আনন্দ যদি আপনার মনে রেখাপাত ক'রে থাকে, সদ্যজাত শিশুর কান্নায় যদি কখনো আনন্দ পেয়ে থাকেন, যদি কোন মানবিক বোধ কখনো আপনার বুকে উঁকি মেরে থাকে, আমি স্ত্রীর

প্রেমিকের মায়ের অনুভূতির দোহাই দিয়ে জীবনে যা কিছু পবিত্র, তার দোহাই দিয়ে একান্ত মিনতি করছি—আমার প্রার্থনা ফিরিয়ে দেবেন না। আপনার গোপন কৌশলটা আমাকে বলে দিন। এ আপনার কী কাজে লাগবে? হয়ত হতে পারে এই ঘটনা জড়িত কোন ভয়ঙ্কর পাপের সঙ্গে, অনন্ত নরকবাসের সঙ্গে, কোন শয়তানকে খবরা দেওয়ার সঙ্গে, কিন্তু আপনি বৃদ্ধা, হয়ত বহুদিন আর বাঁচবেন না—আমি আপনার সমস্ত পাপ মাথায় তুলে নিচ্ছি। আপনার কৌশলটা শুধু আমায় বলে দিন। মনে করুন, একজন লোকের সুখ আপনার হাতে, শুধু আমি নই, আমার ছেলেরা, আমার নাতিরা আপনার স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখবে।"

বৃদ্ধা কাউন্টেস একটি কথারও উত্তর দিলেন না। হারম্যান উঠে দাঁড়াল। "ওরে বুড়ি!" দাঁত কড়মড় ক'রে সে চেঁচিয়ে উঠল, "তাহলে আমি উত্তর আদায় ক'রে নেব।"

এই কথাগুলো বলে পকেট থেকে সে এক পিস্তল বার করল।

পিস্তল দেখে কাউন্টেসের আবার তীব্র আবেগ প্রকাশ পেল। তিনি মাথা নেড়ে হাত তুললেন যেন হাত দিয়ে গুলিটা বাধা দিতে চান—তারপর পেছনের দিকে গড়িয়ে পড়ে নিথর হ'য়ে গেলেন।

"কচি খুকির মতো ন্যাকামির শেষ হোক।" হারম্যান বলল, "আমি শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, তিনটে তাসের নাম আমাকে বলবেন কি না?"

কাউন্টেসের কোন উত্তর নেই। হারম্যান বুঝল, তিনি পরলোকে।

৪

লিজাভেটা তখনো নাচের পোশাকে নিজের ঘরে বসে চিন্তায় বিভোর। বাড়ি ফিরে এসে তাড়াতাড়ি আয়াকে বিদায় দিয়েছে, খুব অনিচ্ছার সঙ্গে সাহায্য করতে সে এগিয়ে এসেছিল; ও বলেছিল নিজেই পোশাক খুলে নেবে। কম্পিত হৃদয়ে নিজের ঘরে ঢুকল হারম্যানকে দেখতে পাবার আশা নিয়ে, অথচ আকাঙ্ক্ষা যেন না দেখতে পায়। প্রথমচাহনিতেই নিজেকে নিশ্চিন্ত ক'রে নিল ঘরে সে নেই; ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল—যে কারণেই হোক, তার আসাটা বন্ধ হয়েছে।

পোশাক না খুলেই সে বসে পড়ল এবং সেই সব পরিস্থিতি-গুলো স্মরণ করতে লাগল যা এত অল্প সময়ের মধ্যে তাকে অতদূর টেনে নিয়ে গেছে। তরুণ অফিসারটিকে জানালা দিয়ে দেখার পর এখনো তিন সপ্তাহ হয়নি, তবু এরই মধ্যে অফিসারটিকে সে নৈশ-সাক্ষাতে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। সে তার নাম জানতো শুধু কতকগুলো চিঠিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করেছিল বলে। কখনো তার সঙ্গে বাক্যালাপ হয়নি, কখনো কণ্ঠস্বর শোনেনি এবং সেদিন সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত কারুর মুখে তার কথা শোনেনি।

কিন্তু অদ্ভুত লাগে ভাবতে, সেদিন সন্ধ্যায় 'বল' নাচে তরুণী প্রিন্সেস পলিনের ওপর টমস্কি অভিমান করেছিল টমস্কির সঙ্গে ও বরাবরে যোগ দেয়নি ব'লে। এর প্রতিশোধ হিসেবে উদাসীনতার ভান ক'রে অনবরত 'মাজুরকা' নাচে লিজাভেটাকে ব্যস্ত রাখল টমস্কি। সারা নাচে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি ওর পক্ষপাতিত্বে টিপ্পনি কেটেছে সে; জোর দিয়ে বলেছে যতটা সে সন্দেহ করে তার চেয়েও বেশি জানে সে, এবং কতকগুলো টিপ্পনির এত সরস লক্ষ্য ছিল সে, যে লিজাভেটা ভেবেছে যে তার রহস্য বুঝি টমস্কি জেনে গেছে।

"কোথা থেকে তুমি এ-সব শিখলে ?" লিজাভেটা স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করেছিল।

"এক বন্ধুর কাছ থেকে, সে তোমার খুব পরিচিত," টমস্কি বলেছিল, "এক বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে।"

"কে এই বিশিষ্ট ব্যক্তি ?"

"তার নাম হারম্যান।"

লিজাভেটা কোন জবাব দেয়নি, তার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছিল।

"এই হারম্যান ব্যক্তিটি ভাবময় চরিত্রের লোক। নেপোলিয়ানের মতো তার মাথা এবং মেফিসটোফিলিসের মতো তার আত্মা। আমার বিশ্বাস এই লোকটার বিবেকে অন্তত তিনটে পাপ বাসা বেঁধে আছে।···তুমি কি-রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেলে।"

"মাথা ধরেছে···কিন্তু এই ব্যক্তিটি হারম্যান না-কি নাম যেন—বলেছে তোমায় ?"

"হারম্যান তার বন্ধুর প্রতি খুব অসন্তুষ্ট। বলে, তার জায়গায় সে হ'লে অন্যরকম ব্যবহার করত।···এমনকি আমার মনে হয় হারম্যান তোমার ওপরেও মতলব রাখে; অন্তত তোমার সম্বন্ধে অন্যান্য বন্ধুদের বক্তব্য ও খুব মন দিয়ে শোনে।"

"ও আমায় দেখল কোথায় ?"

"কোন গির্জা বা প্রমোদ-বিহারে হ'তে পারে—ভগবান জানেন কোথায়। হ'তে পারে তোমার ঘরেও, তুমি হয়ত তখন ঘুমন্ত; কারণ এমন কিছু নেই যা সে না—"

"হঠাৎ লিজাভেটার সঙ্গে এই গভীর আলোচনায় বাধা দিয়ে তিনজন মহিলা এসে প্রশ্ন করল "নাচবে না আপশোষ করবে ?"

টমস্কি যাকে বেছে নিল সে হ'ল প্রিন্সেস পলিন স্বয়ং। নাচের মধ্যে পলিন ব্যাপারটা মিটমাট ক'রে নিল এবং নাচ শেষ হ'লে টমস্কি তাকে চেয়ারে এগিয়ে দিল। নিজের জায়গায় পৌঁছে হারম্যান বা

লিজাভেটা কারুর কথাই টমস্কি ভাবল না। লিজাভেটা বাধাপ্রাপ্ত আলোচনা শুরু করার আগ্রহ বোধ করতে লাগল। কিন্তু মাজুরকা নাচ শেষ হ'য়ে এল এবং অল্প পরেই কাউন্টেস বিদায় নিলেন।

টমস্কির কথাগুলো যথারীতি নাচের টুকরো টুকরো কথার বেশি নয়, কিন্তু তরুণী প্রেমকাহিনীর গভীর অন্তস্তলে সে কথাগুলো গিয়ে পৌঁছল। টমস্কির আঁকা চেহারা তার মনের কল্পিত ছবির সঙ্গে মিলে গেছল। শেষের দিকের অভিযানগুলোয়, তার প্রেমিকের সাধারণ চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণাবলী চোখে পড়ল, যা তাকে একই সঙ্গে আশঙ্কিত ক'রে রাঙিয়ে তুলল।

সে এখন ব'সে, অলঙ্কারহীন হাতদুটো আড়ভাবে রাখা, তখনো ফুলে গোঁজা মাথাটা অর্ধ-উন্মুক্ত বুকের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। হঠাৎ দরজা খুলে হারম্যান প্রবেশ করল।

"কোথায় ছিলে তুমি," লিজাভেটা সঙ্কুচিত হয়ে ভয়ার্ত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

"বৃদ্ধা কাউন্টেসের শোবার ঘরে," হারম্যান উত্তর দিল, "আমি এইমাত্র তাঁর কাছ থেকে আসছি। কাউন্টেস মারা গেছেন।"

"হায় ভগবান! কি বলছ তুমি!"

"আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তাঁর মৃত্যুর কারণ আমিই!" হারম্যান বলল।

লিজাভেটা তার দিকে তাকাল। টমস্কির কথার প্রতিধ্বনি সে নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পেল 'এই লোকটার বিবেকে অন্তত তিনটে পাপ বাসা বেঁধে আছে।' হারম্যান তার পাশে বসে যা ঘটেছে সব বলল।

লিজাভেটা শঙ্কিত হ'য়ে শুনল। এই জন্যেই এত আবেগপূর্ণ চিঠিগুলো, এত তীব্র কামনা, এই নির্ভীক বেপরোয়া অভিযান— এ-সব প্রেমের জন্যে নয়! টাকা—এর জন্যেই ওর আত্মা ক্ষুব্ধ;

লিজাভেটা তার হৃদয়ের কামনা পূরণ ক'রে তাকে সুখী করতে পারেনি। হতভাগিনী তার বৃদ্ধা আশ্রয়দাত্রীর খুনী দস্যুর অন্ধ হাতিয়ার ভিন্ন আর কিছুই নয়!...মর্মান্তিক অনুতাপের তিক্ত অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল।

হারম্যান নীরবে তার দিকে চাইল। তারও হৃদয়ে উদ্দাম আবেগ বইছিল, কিন্তু হতভাগিনীর অশ্রু বা বিষাদে আরও উজ্জ্বল অপরূপ সৌন্দর্য হারম্যানের নিকষ স্বভাবে কোন দাগই কাটতে পারল না। বৃদ্ধা মহিলার মৃত্যুতে সে বিবেকের কোন দংশনই বোধ করছিল না। একটা জিনিস শুধু তাকে দুঃখ দিচ্ছিল—গুপ্ত কৌশল খুইয়ে ফেলার অপূরণীয় ক্ষতি, যা থেকে অফুরন্ত ঐশ্বর্যের আশায় সে প্রহর গুণছিল।

"তুমি একটা শয়তান!" অবশেষে লিজাভেটা বলল।

"ওঁকে হত্যা করার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না," হারম্যান উত্তর দিল, "আমার পিস্তলে তো গুলি ভরা ছিল না।" তারপর উভয়েই নিস্তব্ধ রইল।

তখন ভোর হ'তে শুরু করেছে। লিজাভেটা বাতি নিভিয়ে দিতে একটা ম্লান আলো ঘরে এসে পড়ল। অশ্রুসজল চোখ মুছে হারম্যানের দিকে তাকাল। সে হাত আড়ভাবে ক'রে জানালার ধারে ব'সে, কপালে তার তীব্র ভ্রূকুটির চিহ্ন। এই ভঙ্গিতে নেপোলিয়ানের ছবির সঙ্গে আশ্চর্য মিল, এমনকি লিজাভেটার চোখেও পড়ল।

"তোমাকে কি ক'রে বাড়ির বাইরে পৌঁছে দেব?" অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করল। "ভেবেছিলাম, তোমাকে গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব; তাহলে কাউন্টেসের শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, কিন্তু আমার ভয় করছে।"

"কোথায় সিঁড়ি পাব বলে দাও—আমি একাই যাব।"

লিজাভেটা উঠে টানা থেকে একটা চাবি বার ক'রে প্রয়োজনীয়

পথ-নির্দেশ হারম্যানকে বুঝিয়ে দিল। হারম্যান তার ঠাণ্ডা হাতে করমর্দন করল এবং ঝুঁকে-পড়া মাথায় চুমু খেয়ে ঘর পরিত্যাগ করল।

হারম্যান ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে নেমে আর-একবার কাউণ্টেসের শোবার ঘরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধা মহিলা বসেছিলেন, এখন যেন পাথরে পরিণত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে গভীর শান্তির ব্যঞ্জনা। হারম্যান তাঁর সামনে থামল, এবং দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ চাহনিতে কঠিন বাস্তবে নিশ্চিত হয়ে নিল। অবশেষে ক্যাবিনেটে প্রবেশ ক'রে দরজার পেছনের পর্দা সরিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। অদ্ভুত আবেগে সে পূর্ণ।

সিঁড়ির শেষে হারম্যান একটা দরজা পেয়ে চাবি দিয়ে খুলল সেটা। একটা চাতাল পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

৫

সেই কাল-রাত্রির তিনদিন পরে সকাল ন'টায় হারম্যান কনভেণ্টে এল। বৃদ্ধা কাউণ্টেসের শেষকৃত্য সেখানে অনুষ্ঠিত হবে। কোন অনুশোচনা তার ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধা মহিলার যে তুমিই হত্যাকারী, বিবেকের এই দংশন থেকে সম্পূর্ণরূপে সে নিজেকে এড়াতে পারেনি। ধর্মে বিশ্বাস তার ছিল না বললেই চলে, কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পাছে বৃদ্ধা কাউণ্টেস তার জীবনে কোন খারাপ প্রভাব বিস্তার করেন, সেই ভয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে মার্জনা পাবার আশায় এল।

মানুষে ভর্তি গির্জা। বিশেষ কষ্ট ক'রে ভীড় ঠেলে হারম্যান পথ ক'রে নিল। ভেলভেট চাঁদোয়ার নিচে কারুকার্যখচিত শবাধারে কফিনটি রাখা। বৃদ্ধা কাউন্টেস এর মধ্যে শায়িত। বুকের ওপর হাত আড়ভাবে রাখা, মাথায় লেসের টুপি এবং গায়ে সাদা সাটিনের পোশাক। শবাধার ঘিরে বাড়ির লোকেরা দাঁড়িয়ে, কালো চাপরাস-পরা চাকরেরা বাতি ধ'রে, তাদের কাঁধে সম্মানসূচক ফিতের গেঁট; আত্মীয়স্বজন, শিশুরা, নাতিরা এবং নাতির ছেলেরা —সবাই গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন।

কেউই কাঁদছিল না, কান্নাটা বেমানানও হ'ত। কাউন্টেস এত বৃদ্ধা হয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুতে কারুরই অবাক হবার কিছু নেই। তাঁর আত্মীয়েরা বহু আগেই ভাবতে শুরু করেছিল তিনি ইহজগতে নেই। এক বিখ্যাত পুরোহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন; ধর্মপ্রাণার বহু বছর ধরে খ্রীষ্টীয় লক্ষ্যে পৌঁছবার নীরব প্রস্তুতি এবং তাঁর শান্তিপূর্ণ তিরোধান সহজ এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি বর্ণনা করছিলেন। বক্তা বলছিলেন, "মৃত্যুদূত এসে দেখেন, তিনি ধর্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে মধ্যরাত্রে মিলনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।"

গম্ভীর নীরবতার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হ'ল।

মৃতের কাছ থেকে বিদায় নিতে প্রথম এগিয়ে এলেন আত্মীয়েরা। তারপর এলেন বিভিন্ন অতিথিরা বহু বছরের আমোদের সঙ্গীকে শেষ বিদায় দিতে, তারপর এলেন কাউন্টেসের বাড়ির লোকেরা। এঁদের মধ্যে সবশেষে এলেন মৃতের সমবয়সী এক বৃদ্ধা। দু'জন তরুণী হাত ধরে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে এল। মাটিতে হেঁট হবার মতো শক্তি তাঁর নেই; তিনি শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেললেন এবং ঠাণ্ডা হাতটি চুম্বন করলেন।

এবার হারম্যানের কফিনের কাছে যাবার ইচ্ছে হ'ল। ঠাণ্ডা পাথরের ওপর নতজানু হ'য়ে কয়েক মিনিট একইভাবে সে রইল।

অবশেষে সে উঠল, বৃদ্ধা কাউন্টেসের মতোই পারত, কয়েক ধাপ উঠে শবের উপর ঝুঁকে পড়ল।—সে সময় তার মনে হ'ল যেন বৃদ্ধা একচোখ বুজে তার দিকে বিদ্রূপের চাহনি নিক্ষেপ করছেন।

হারম্যান চমকে ফিরে আসতে একটা ভুল ধাপ নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। জনকয়েক দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে তুলে ধরল। একই মুহূর্তে গির্জার বাইরের সেঁউড়িতে লিজাভেটাও অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

এই ঘটনায় গাম্ভীর্যপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কয়েক মিনিট বাধা পড়ল এবং সমবেত জনতার মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। মৃতের এক আত্মীয় পাশের একজন দীর্ঘায়ত শুশ্রূষাধায়ক ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে চুপিচুপি বললেন যে ঐ তরুণ অফিসারটি কাউন্টেসের অজাত-পুত্র কি না তাই। উত্তরে ইংরেজটি নির্বিকারভাবে বললেন, "ওঃ!"

সারাদিন হারম্যান অদ্ভুতরকম উত্তেজনায় কাটাল। অনভ্যস্ত এক রেস্তুরেন্টে গিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ প্রচুর মদ খেল ভেতরের উত্তেজনা দূর করতে পারার আশায়, কিন্তু মদ তার উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তুলল। বাড়ি ফিরে এসে পোশাক না খুলেই বিছানার ওপর নিজেকে ছুঁড়ে ফেলল তারপর গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন সে উঠল, তখন রাত হয়েছে, ঘরের মধ্যে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকাল, পৌনে তিনটে। ঘুম তার ছেড়ে গেছে; বিছানার ওপর বসে কাউন্টেসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা ভাবতে শুরু করল।

সেই মুহূর্তে রাস্তা থেকে কে যেন উঁকি দিয়ে দেখেই সরে গেল। হারম্যান এ ঘটনায় কোন মনোযোগ দিল না। কয়েক মুহূর্ত পরে পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। হারম্যান ভাবল, বুঝি তার চাকর নৈশ অভিযান সেরে যথারীতি বাড়ি ফিরছে; কিন্তু পরে পায়ের শব্দ অচেনা ঠেকল—কে যেন চটি পরে

হালকা পায়ে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাদা পোশাক-পরা এক নারী দরজা খুলে ঢুকল। হারম্যান তাকে তার বৃদ্ধা নার্স বলে ভুল করে আশ্চর্য হ'য়ে ভাবল এত রাত্রে কিসের জন্যে সে এসেছে। সাদা মূর্তিটি তাড়াতাড়ি ঘর পেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল—হারম্যান চিনতে পারল, তিনি কাউন্টেস।

"ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমাকে আসতে হ'ল" দৃঢ় গলায় তিনি বললেন, "তোমার অনুরোধটা রাখবার আমি আদেশ পেয়েছি। তিরি, সাতা, টেক্কা যদি পরের পর খেল, জিততে পারবে। কিন্তু একটা শর্ত, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একতাসের বেশি খেলতে পারবে না এবং বাকি সারা জীবনে আর দ্বিতীয়বার খেলতে পারবে না। আমার মৃত্যুর জন্যে তোমাকে মার্জনা করছি এই শর্তে যে আমার সঙ্গী লিজাভেটা ইভানোভনাকে তুমি বিয়ে করবে।"

এই কথা ব'লে তিনি ধীরে পেছন ফিরে পা ঘসে ঘসে দরজার কাছে গিয়ে অদৃশ্য হলেন। হারম্যান শব্দ শুনল, সদর দরজা খুলে বন্ধ হ'ল এবং লক্ষ্য করল কে যেন আবার জানালা দিয়ে দেখল।

বহুক্ষণ পরে হারম্যান নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে পারল না। সে উঠে পাশের ঘরে গেল। তার চাকর মেঝের উপর ঘুমে অচেতন, এবং তাকে জাগাতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। যথারীতি চাকরটা মদ খেয়েছিল এবং কোন খবরই তার কাছ থেকে পাওয়া গেল না। সদর দরজা তালা বন্ধ। হারম্যান ঘরে ফিরে এসে বাতি জ্বেলে এই অপচ্ছায়ার বিশদ বিবরণ লিখে রাখল।

৬

পার্থিব জগতে যেমন দুটি বস্তু একই স্থান অধিকার ক'রে থাকতে পারে না, তেমনি নৈতিক জগতে দু'টি স্থির চিন্তা একত্রে বাঁচাতে পারে না। 'তিরি, সাত্তা, টেক্কা' তার মগজ থেকে কাউন্টেসের চিন্তা দূর ক'রে দিল। 'তিরি, সাত্তা, টেক্কা' সব সময়েই তার মগজে খেলছে এবং অনবরত মুখে লেগে রয়েছে। তরুণী মেয়ে দেখলে বলবে, "কী রোগা মেয়েটি, ঠিক হরতনের তিরির মত।" কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কটা বেজেছে, ও উত্তর দেবে "সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট।" মোটা লোক দেখলেই তার টেক্কার কথা মনে পড়ে যেত। 'তিরি, সাত্তা, টেক্কা' তা'র স্বপ্নেও বিচরণ করত এবং সর্বপ্রকার সম্ভাব্য রূপ গ্রহণ করত। তিরি ফুলের আকারে ফুটে উঠত, সাত্তা গথিক তোরণের আকারে এবং টেক্কাগুলো প্রকাণ্ড মাকড়সার আকারে। একটি চিন্তা শুধু মনকে দখল ক'রে রইল, এতো মহামূল্যে খরিদ-করা গোপন কৌশলটা কি ক'রে কাজে লাগাবে। ভাবল, বিদেশে যাবার জন্য ছুটির আবেদন করবে। প্যারিসে গিয়ে একবার কোন জুয়াখানায় ভাগ্যপরীক্ষা করবে। কিন্তু একটা সুযোগ আসাতে তাকে এ কষ্ট করতে হ'ল না।

তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। ভারি সম্ভ্রান্ত চেহারায় রূপোর মত সাদা চুলে মাথা ভর্তি, তাঁর পূর্ণ উজ্জ্বল চেহারায় সৎ-স্বভাবের প্রকাশ, সদাসর্বদা স্মিত হাসির ঝলক চোখে মাখান। নরউমভ হারম্যানকে পরিচয় করিয়ে দিল। চেকালিনস্কি সৌহার্দ্যপূর্ণ করমর্দন ক'রে লৌকিকতা করতে নিষেধ ক'রে খেলা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সে-খেলাটি কিছুক্ষণ ধরে চলল। টেবিলের ওপর ত্রিশটিরও

বেশি তাস। প্রত্যেকবার তাস বিতরণ করার পর চেকালিনস্কি অল্পক্ষণ করে সময় দিচ্ছিলেন যাতে তারা তাস গুছিয়ে নিতে পারে এবং হেরে-যাওয়া টাকার অঙ্কটা হিসেব করতে পারে; বিনয়ের সঙ্গে তাদের অনুরোধে তিনি কর্ণপাত করছিলেন এবং ততোধিক বিনয়ের সঙ্গে কোন খেলোয়াড়ের হাত লেগে মোড়া তাসের কোণগুলো সোজা করছিলেন। অবশেষে এ-হাত খেলা শেষ হল, চেকালিনস্কি তাস শাফ্‌ল্‌ করলেন এবং বিতরণ করতে উদ্যত হলেন।

"আমাকে একটা তাস টানতে দেবেন?" এই ব'লে হারম্যান একটা মোটা খেলোয়াড়ের পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে দিল। নরউমভ হেসে হারম্যানকে এতদিনকার তাসের প্রতি অনাসক্তি পরিত্যাগ করার জন্যে অভিবাদন করল এবং কামনা করল তার শুরু সৌভাগ্যপূর্ণ হোক।

"বাজি!" তাসের পেছনে খড়ি দিয়ে একটা সংখ্যা লিখে হারম্যান বলল।

"কতো?" আড়চোখে চেয়ে চেকালিনস্কি জিজ্ঞাসা করলেন। "মাফ করবেন, আমি খুব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না।"

"সাতচল্লিশ হাজার রুবল," হারম্যান জবাব দিল।

এই কথাতে হঠাৎ ঘরের প্রত্যেকটি মাথা ঘুরে হারম্যানের দিকে ফিরল এবং তার দিকে প্রত্যেক জোড়া চোখ নিবদ্ধ হ'ল।

'ওর মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে'—নরউমভ ভাবল।

"আমাকে বলতে দিন," চেকালিনস্কি তাঁর চিরন্তন স্মিত হাসি হেসে বললেন, "আপনার বাজিটা বোধহয় চড়া ধরা হয়ে গেছে। কেউই এখানে এর আগে প্রথম দানে দু'শ পঁচাত্তর রুবলের বেশি ধরেনি।"

"উত্তম," হারম্যান বলল, "কিন্তু আপনি আমার তাস নিচ্ছেন কি না?"

চেকালিনস্কি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

"আমি শুধু দেখতে চাই যে নগদ টাকায় খেলাটা যেন হয়, অবশ্য বন্ধুদের প্রতি গভীর বিশ্বাস আমার আছে," তিনি বললেন।

বহু উচ্চমূল্যের একখানা ব্যাঙ্কনোট হারম্যান পকেট থেকে বার করে চেকালিনস্কিকে দিল। সেটাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হারম্যানের তাসের ওপর রাখলেন।

তিনি তাস দেওয়া শুরু করলেন। ডানদিকে উঠল একটা নওলা এবং বাঁদিকে একটা তিরি।

"আমি জিতেছি!" তাস দেখিয়ে হারম্যান বলল।

খেলোয়াড়দের মধ্যে বিস্মিত হওয়ার গুঞ্জন উঠল। চেকালিনস্কির ভ্রু সঙ্কুচিত হ'ল কিন্তু শীঘ্রই আবার মুখে হাসি ফিরে এল।

"আপনি কি একুনি মিটিয়ে নিতে চান?" হারম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন চেকালিনস্কি।

"যদি অনুগ্রহ করেন।" ও উত্তর দিল।

চেকালিনস্কি পকেট থেকে খানকয়েক নোট বার ক'রে হারম্যানকে তখুনি দিয়ে দিলেন। টাকা নিয়ে সে টেবিল পরিত্যাগ করল। নরউমভ বিস্মিতভাব কাটিয়ে উঠতে পারল না। হারম্যান এক গেলাস লেমনেড পান ক'রে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের দিন সন্ধেবেলায় সে আবার চেকালিনস্কির ওখানে গেল। মালিক খেলছিলেন তখন। হারম্যান টেবিল পর্যন্ত যেতেই সকলে তাকে জায়গা করে দিল। চেকালিনস্কি সম্ভ্রমের সঙ্গে নত হয়ে অভিবাদন করলেন। হারম্যান পরের দানের জন্যে অপেক্ষায় একটা তাসের ওপর নিজের সাতচল্লিশ হাজার রুবল এবং গতদিনের জেতা টাকাটা রাখল।

চেকালিনস্কি তাস দেওয়া শুরু করলেন। ডানদিকে একটা গোলাম উঠল, বাঁদিকে সাত্তা।

হারম্যান তার সাত্তা দেখাল।

একটা বিস্ময়ের স্রোত বয়ে গেল। স্পষ্টত চেকালিনস্কি চঞ্চল হয়ে উঠলেন; কিন্তু চুরানব্বই হাজার রুবল গুণে গুণে হারম্যানের হাতে তুলে দিলেন। হারম্যান একান্ত শান্তভাবে নোটগুলো পকেটস্থ করে স্থান পরিত্যাগ করল।

পরের দিন সন্ধ্যায় হারম্যান আবার এল। প্রত্যেকেই তাকে আশা করছিল। সেনানায়কেরা ও প্রিভিকাউন্সিলারেরা এ রকম অসাধারণ খেলা দেখবার জন্যে হুইস্ট খেলা বন্ধ রাখল। যুবক অফিসারেরা সোফা ছেড়ে এল; এমনকি চাকরেরা এসে ঘরে ভীড় করল। সবাই হারম্যানকে ঘিরে। সকলেই অধৈর্য হয়ে নিজের নিজের খেলা বন্ধ রাখল এই খেলার শেষ দেখার জন্যে। হারম্যান টেবিলে দাঁড়িয়ে, পাংশু হলেও তখনো স্মিতানন-চেকালিনস্কির বিরুদ্ধে একাই খেলতে প্রস্তুত। দুজনেই নতুন তাসের প্যাক খুলল। চেকালিনস্কি শাফ্‌ল্ করলেন। হারম্যান একটা তাস নিয়ে একতাড়া নোট দিয়ে ঢেকে রাখল। এ যেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। গভীর নিস্তব্ধতা সর্বত্র ছেয়ে রইল।

চেকালিনস্কি তাস দিতে শুরু করলেন; তাঁর হাত কাঁপছিল। ডানদিকে বিবি ও বাঁদিকে টেক্কা উঠল।

"টেক্কা জিতেছি" তাস দেখিয়ে হারম্যান চেঁচিয়ে উঠল।

"আপনার বিবি হেরে গেছে," বিনয় সহকারে চেকালিনস্কি বললেন।

হারম্যান চমকে উঠল; টেক্কার বদলে সামনে দেখল ইশকাপনের বিবি। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, বুঝে উঠতে পারল না তার দ্বারা এ ধরনের ভুল কি করে সম্ভব হ'ল।

সেই মুহূর্তে তার মনে হ'ল ইশকাপনের বিবি চোখের ইশারায় তাকে ব্যঙ্গ করে হাসছে।...সে অবাক হয়ে গেল, তার সঙ্গে অস্বাভাবিক রকমের ঐক্য রয়েছে......

"বুড়ি কাউন্টেস!" ভয়ার্ত সে চিৎকার করে উঠল।

চেকালিনস্কি জেতা টাকাগুলো জড়ো করে নিলেন। হারম্যান কিছুক্ষণ ধরে সম্পূর্ণ নিস্পন্দ রইল। অবশেষে যখন সে টেবিল পরিত্যাগ করল, ঘরের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের হাওয়া বয়ে গেল।

"আশ্চর্য রকম হেরে গেছে।" খেলোয়াড়রা বলাবলি করল। চেকালিনস্কি তাস শাফ্‌ল্ করলেন এবং যথারীতি খেলা চলতে লাগল।

• • •

হারম্যান পাগল হয়ে গেছে। অবুকভ হাসপাতালে সতের নম্বর ঘরে সে আবদ্ধ। কোন প্রশ্নের সে উত্তর দেয় না। শুধু অনবরত অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বিড়বিড় ক'রে বলে চলে, "তিরি, সাত্তা, টেক্কা!" "তিরি, সাত্তা, বিবি!"

সৎ চোর

আগ্রাকেনা আমার রাঁধুনীর নাম। সে কাপড়-চোপড়ও কাচে, ঘরদোরও দেখাশোনা করে। একদিন সকালবেলা কাজে বেরোবো, এমন সময় আগ্রাকেনা এসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করতে একদম অবাক হয়ে গেলাম। একটি শান্তশিষ্ট গোবেচারী প্রাণী সে; বাড়ির রান্নার বিষয়ে দু-একটা জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া গত দু'বছর ধ'রে বোধহয় সে আর কোন কথাই বলেনি। অন্তত এর বেশি কথা আমার কানে আসেনি।

আকস্মিকভাবে সে শুরু করল, "বলছিলাম, ছোট ঘরটা যদি ভাড়া দেন।"

"কোন্ ছোট ঘরটা?"

"রান্নাঘরের পাশে যেটা, জানেনই তো কোন্‌টা?"

"কেন?"

"কেন আবার? লোকে তো ভাড়াটে রাখে। তাই আর কি?"

"কে ভাড়া নেবে?"

"কে আর নেবে? ভাড়াটে বই আর কে?"

"কিন্তু ভালোমানুষের মেয়ে! ওখানটা এত সরু যে একটা খাট রাখারও জায়গা নেই। থাকবে কে ওখানে?"

"যে থাকতে চায়! ওটা শুধু শোবার জায়গা হবে। থাকবে সে জানালার ধারে।"

"কোন্ জানালা?"

"জানেন না যেন! বড় ঘরটার জানালায়। ওখানে বসে সেলাই-ফোঁড়াই বা যাহোক কিছু করবে। বলেন যদি, একটা চেয়ারেও বসতে পারে। তার চেয়ার-টেবিল সব জিনিসই আছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ধরনের লোক সে ?"

"লোক ভালো, জ্ঞানগম্যি আছে। আমি তার খাবার তৈরি ক'রে দেবো আর খাওয়া-থাকা বাবদ মাসে তিন রুবল ক'রে আদায় করব।"

অবশেষে বুঝলাম যে, কোন বজ্জ লোক তাকে কোন প্রকারে ভজিয়েছে, নাহোক রাজী করিয়েছে রান্নাঘরে ভাড়াটে হিসেবে নিতে। আগ্রাফেনার মাথায় একটা-কিছু একবার ঢুকলে, তা মানতেই হবে ; নতুবা জানি সে আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না। তার মনোমতো কিছু না হ'লে সে তক্ষুণি মুখ-গোমড়া ক'রে গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাবে, আর এই অবস্থা চলবে দু-তিন হপ্তা ধরে। তখন তার রান্না মুখে দেওয়া যায় না, কাপড়-চোপড় নোংরা থাকে, ঘরে ঝাঁট পড়ে না, এককথায় প্রাণান্তকর অবস্থা। অতএব নিজের মানসিক শান্তির কথা ভেবে আমি তক্ষুণি রাজী হ'য়ে গেলাম।

"তার পাসপোর্ট বা কোন রকম কাগজ-পত্র আছে নাকি ?"—জিজ্ঞাসা করলাম।

"নিশ্চয়ই লোকটা ভালো, তার বেশ জ্ঞানগম্যি আছে ; আর তিন রুবল ক'রে দেবে বলে কথাও দিয়েছে।"

পরের দিন আমার সেই একক পরিবারহীন ফ্ল্যাটে নূতন ভাড়াটের আবির্ভাব ঘটল। আমি কিন্তু বিরক্ত হলাম না ; বরঞ্চ বলতে কি, নিজের কথা ভেবে খুশীই হলাম। আগ্রাফেনা মিথ্যে বলেনি ; আমার ভাড়াটেটি বেশ অভিজ্ঞ লোক। তার পাসপোর্ট থেকে মনে হ'ল, সে একজন পুরানো ফৌজী ; অবশ্য তার মুখেও সে কথাটা লেখা ছিল এবং প্রথম নজরেই আমি তা ধরতে পেরেছিলাম। আমার ভাড়াটে আস্তাফি ইভানোভিচ লোকটি ফৌজী-লোকদের মধ্যে সেরা একজন। আমাদের মধ্যে বেশ মিল হল। আমার সবচেয়ে ভালো লাগত যে সে তার জীবন-স্মৃতি

মাঝে মাঝে রোমন্থন করত। আমার নিশ্চিন্ত মনশ্চক্ষুতে এমনি কাহিনীকার একটি পরম বস্তুবিশেষ। একটি কাহিনী একবার সে আমায় বলেছিল; কাহিনীটি আমার মনে ছাপ রেখে ছিল। কিন্তু কেন সে আমাকে বলেছিল, সে ঘটনাটি আগে বলি।

ফ্ল্যাটটিতে আমি একবার একা পড়ে গেলাম। আন্তাকি ও আন্নাকেনা দুজনেই নিজের নিজের কাজে বেরিয়েছে। হঠাৎ কে যেন অচেনা একজন পাশের ঘরে ঢুকেছে মনে হ'ল। দেখতে গেলাম, দেখলাম সত্যিই একটি অচেনা লোক ঘরে ঢোকবার ছোট্ট পথটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে; লোকটি আকারে ছোট, শীতকাল সত্বেও গায়ে কোন ওভারকোট নেই।

"কি চান?"—জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমি সরকারী কর্মচারী আলেক্‌জান্দ্রোভ্‌নার সঙ্গে দেখা করতে চাই, এখানে থাকেন না তিনি?"—সে উত্তর দিল।

"ওরকম কেউ এখানে থাকেন না তো মশাই; আচ্ছা, নমস্কার।"

"নিশ্চয়ই, দারোয়ান বলল তিনি এখানেই থাকেন।" আগন্তুক কৈফিয়ত দিতে দিতে দরজার দিকে পেছতে লাগল।

"আচ্ছা মশাই, আপনি আসতে পারেন।"

পরের দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আন্তাকি ইভানোভিচকে আমি যে-কোটটা অর্ডার করতে দিয়েছিলাম সেই কোটটা সে সেলাই করছিল, এমন সময়ে সেই ছোট্ট পথটায় আবার যেন কে এল। দরজা খুললাম।

কালকের সেই ভদ্রলোকটি আমার ঠিক চোখের সামনেই শান্তভাবে আলনা থেকে আমার লোমওয়ালা ছোট কোটটা তুলে নিল, বগলদাবা করল এবং ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল। আন্নাকেনা সবসময়েই তাকে লক্ষ্য করছিল বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে। কিন্তু কোটটা বাঁচাবার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। আন্তাকি

ইভানোভিচ তক্ষুনি চোরটার পেছনে ছুটে গেল। মিনিট-দশেক বাদে ফিরে এল হাঁফাতে হাঁফাতে, শূন্যহাতে। লোকটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে।

"যাকগে, কপাল, ইভানোভিচ! ভালোই হয়েছে যে সে বড় কোটটা নিতে পারেনি, নয়ত আমাদের মহা মুশকিলে পড়তে হ'ত; বেটা নচ্ছার।"

কিন্তু, এই ঘটনাটি আস্তাফি ইভানোভিচের মনে এতই বিপর্যয় ঘটিয়ে তুললে যে তার দিকে চেয়ে আমি চুরির কথাটা ভুলেই গেছলাম। এই বিপর্যয় সে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। এই মুহূর্তে সে কাজকর্ম ফেলে দিল, পরের মুহূর্তে কি-ক'রে কি-হ'ল সে বলতে শুরু ক'রে দিল—কোথায় কিভাবে সে দাঁড়িয়ে ছিল, তার চোখের সামনেই সে কোটটা তুলে নিল, কেমন সে হতজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল যে চোরটাকে ধরতেই পারল না। তারপর আবার সে কাজটা তুলে নিত; আবার সে সব-কিছু সরিয়ে রেখে দিত। তারপর দেখতাম যে সে দারোয়ানের কাছে গিয়ে এ ধরনের লোককে ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্যে বকুনি শুরু করছে। তারপর ফিরে এসে আবার আগ্রাফেনাকে বকতে শুরু ক'রে দিত। আবার সে কাজে বসত; আপন মনে অনেকক্ষণ ধরে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করত। সোজা কথা, আস্তাফি ইভানোভিচ কাজের লোক হওয়া সত্ত্বেও হৈচৈ-এ ব্যস্তবাগীশ লোক ছিল।

"আস্তাফি ইভানোভিচ, লোকটা আমাদের একদম বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল," এক গেলাস চা এগিয়ে দিয়ে একদিন সন্ধে-বেলায় কথাটা তাকে বললুম। বাসনা, তাকে অপহৃত কোটের কাহিনীটা পুনরাবৃত্তি করতে উৎসাহিত করা। বারবার বিবরণের ফলে এবং কাহিনীকারের একান্ত সততার ফলে ব্যাপারটা বেশ কৌতুকের হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

"লোকটা সত্যিই নিয়ে গেল মশাই! অবশ্য আমার নিজের

কিছু এসে যায় না, কিন্তু তবু আমি বড় বিরক্ত হয়েছি, রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। আমার মতে চোরের চেয়ে অদ্ভুত প্রাণী আর নেই। অত লোকে তোমার মাথায় ঘাম পায়ে ফেলা মেহনতের ফলটা মেরে দেবে! কত না সময় আপনার গেছে! উঃ সাংঘাতিক! এ নিয়ে কিছু বলতে চাই না। আমি যেন ক্ষেপে উঠি। আচ্ছা মশাই, আপনার যে জিনিসটা গেল, চোরটার ওপর আপনার কোনো রাগ নেই?"

"নেই আবার, ইভানোভিচ! জিনিসটা নষ্ট হ'য়ে গেলে অত দুঃখ ছিল না। কোঁকটে একটা চোর সেটা মেরে দেবে, ভাবতেই খারাপ লাগে। কে চায় তার কোনো জিনিস চুরি হ'য়ে যাক!"

"ঠিকই তাই, অবশ্য চোরে চোরে তফাৎ আছে···একবার আমার জীবনে এক সং চোরের দেখা পেয়েছিলাম।"

"সং চোর? চোর আবার সং হয় কি ক'রে?"

"কথাটা ঠিকই, কোন চোরই সং নয়, সে সং হ'তে পারে না। বলছি যে, লোকটাকে মনে হয়েছিল সং, কিন্তু তবু সে চুরি করেছিল। সত্যিই ব্যাপারটা বড় করুণ।"

"ঘটনাটা কি, ইভানোভিচ?"

"বছর-দুই আগে। বছরখানেক ধরে আমার কোন কাজকর্ম ছিল না। কিন্তু তার আগে যখন আমার চাকরি ছিল একটা খাবার-দোকানে একটি সম্পূর্ণ নিঃস্ব লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। লোকটা মাতাল, ভবঘুরে এবং কুঁড়ে। কোথায় যেন কাজ করত কিন্তু মদের দোষে তার চাকরিটা গেল। কী অবস্থার বাড়ী! তার পরনে যে কি ছিল, তা ভগবানই জানেন। দেখলে আপনারও বারবার মনে হ'ত, ওর কোটের নিচে সার্ট আছে কিনা। হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়েই মদ টানতো। হৈ-হল্লোড় কিছু করত না। লোকটার স্বভাব ছিল নরম, মায়া-দয়াও ছিল আর কখনো

কারুর কাছে কিছু চাইত না। দেখলেই আপনার মনে হবে যে একটু মনের দুঃখে লোকটা হাঁকাচ্ছে আর আপনি তখন তাকে একটু ধেড়েও বলবেন। এই ভাবে তার সঙ্গে আলাপ হ'ল। আর সেই থেকে লোকটি আমার সঙ্গে লেগে রইল। কি অদ্ভুত লোক! ঠিক কুকুরের মত আমার পেছনে লেগে রইল। যেখানেই যাই, পেছন পেছন আসে—প্রথম আলাপেই এই অবস্থা। প্রথম দিন রাত্তিরটুকুর আশ্রয় চাইল; রাজী হলুম। তার পাসপোর্টটা দেখলুম; ঠিকই আছে, কোন খুঁত দেখতে পেলুম না। পরের দিনও রাত্তিরের আশ্রয় চাইলে। তৃতীয়বার এলো। সারাদিন জানালার বসে রইল, রাত্তিরটাও থেকে গেল। মনে হ'ল লোকটা আমার সঙ্গে সেঁটে গেল, ওর খাওয়া-দাওয়াও আমার ঘাড়ে চাপল। এই অতিথির বোঝা বইবার মত আমি বড় মানুষ নই। এর আগেও লোকটা আর-একটা রোজগারী লোকের ঘাড়ে চেপেছিল। দুজনেই এক সঙ্গে টানতো, কিন্তু কি-একটা দুর্ঘটনায় সে বেটা টানতে টানতেই পটল তুলল। এই সং চোরটার নাম ছিল, এমিলিয়া এমিলিন ইলুইচ।

"বড় ভাবনায় পড়ে গেলাম, লোকটাকে নিয়ে কি করি, কি ক'রে সরাই। কি ক'রে বলি, 'এমিলিয়ানোভিচ, কেটে পড় চাঁদ, আমার বাড়িটা তোমার যোগ্য জায়গা নয়, ঠিক জায়গায় তুমি আসোনি। ভাঁড়ারে কিছুই থাকবে না, আমার একার খোরাকে কি ক'রে তোমায় পুষি?' আমি অবাক হলাম, এই ধরনের কিছু বললে ও কি করবে ভেবে। কল্পনায় দেখলুম, কি বলছি তা গোড়ায় তার মাথায় ঢুকল না, অনেকক্ষণ আমার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল, তারপর কথাগুলো মাথায় ঢুকলে উঠে দাঁড়াল, তার সেই লাল চেক-কাটা পুঁটলিটা নিল, ভগবান জানেন তার মধ্যে কি আছে, তার ছেঁড়া কোটটা গোছগাছ ক'রে নিতে লাগল, যাতে ফুটোগুলো দেখা না যায়; তারপর দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল—মনে হ'ল আমি যেন তাকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিলাম।

"তারপর ভাবলাম, বোলো, আমায় দিয়ে সুবিধা হবে না, শীগ্‌গির আমি বাসা বদলাব, আমার টিকিটি আর পেতে হচ্ছে না। সত্যি মশাই, আমি কেটে পড়লাম। আলেকজান্ডার ফিলিমোনোভিচ বেঁচে থাকতে আমায় বলেছিলেন, 'আভাকি, তোমার কাজে আমরা খুব খুশী, দেশ থেকে ফিরে এসে ভুলব না, তোমায় আবার কাজে নেব।' তাঁর কাছে ফিরে গেলাম। তাঁর ছিল দয়ার শরীর, কিন্তু সেই বছরেই তিনি মারা গেলেন। যাক সে-কথা, আমার মালপত্তর নিয়ে এক বুড়ির বাড়ির একটা কোণ ভাড়া নিলাম। ঐ কোনটাই শুধু খালি ছিল। বুড়িটা আগে নার্স ছিল; একা লোক; সেই পেনসনে তার দিন চলতো। বেশ ভেবে নিলাম: 'এমিলিয়ানোভিচ, টাদ আমার, বিদায়, তুমি আমার আর নাগাল পাবে না।' কি বলব মশাই! একজনের সঙ্গে দেখা ক'রে সন্ধেবেলায় ফিরে এসে প্রথমেই দেখি, এমিলিয়া সেই বিরাট কোটটি পরে, পুঁটলিটি পাশে রেখে আমার তোরঙ্গের ওপরে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে… একঘেয়েমি কাটাতে বুড়ির প্রার্থনার বইটা হাতে নিয়ে আছে, তা আবার উল্টো ক'রে ধ'রে। হায়, আবার ধ'রে ফেলল; খুব দমে গেলাম। ভাবলাম, এখন আর কিছু করার উপায় নেই, গোড়াতেই কেন খেদিয়ে দিইনি। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, 'পাসপোর্ট এনেছ, এমিলিয়া?'

"বসে পড়ে ভাবতে লাগলাম, 'এই ভবঘুরে লোকটা কি আমার খুব বেশি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে? খতিয়ে দেখে মনে হ'ল, 'তা হবে না। ও বেশি খায় না। সবাই জানে, মদ যে বেশি খায় সে কিছু খেতে পারে না।' তারপর মাথায় একটা উদ্দেশ্য এল, লোকটার উপকার করব। ভাবলাম, 'লোকটাকে জাহান্নম থেকে তুলব, মদের হাত থেকে বাঁচাব।' বললাম, 'থাকতে পার এমিলিয়া, কিন্তু যা বলব তা শুনতে হবে, আমার কথামত চলতে হবে।'

"ভাবলাম, 'কোনো কাজ শেখাবো, তবে গোড়াতেই নয়, কিছু

"আমার রাগও হল, দয়াও হ'ল। 'সিঁড়িতে পড়ে না থেকে তবু যদি একটা কাজের ধান্দা দেখতে!'

" 'আমি কী কাজে লাগতে পারি, আজ্ঞাকি?'

" 'ভূত কোথাকার, তবু যদি ফাঁকিদিয়িটা শিখতে। এই একটা কোট পরে আছ, ছেঁড়া কম্বলের বেহদ্দ, এটা দিয়ে আবার সিঁড়িও ঝাঁট দিচ্ছ। ছুঁচ-সুতো নিয়ে এটাকে একটু সেলাই কর, বাবা, নিজের আত্মসম্মানের জন্যে। মোদো-মাতাল, অকম্মার ধাড়ী!'

"সত্যিই মশাই, লোকটা হাতে ছুঁচ তুলল। আমি অবশ্য বকার জন্যে বলেছিলাম; কিন্তু লোকটা ভয় পেয়ে গেল, আমার কথা শুনতে লাগল। কোটটা খুলে ফেলে ছুঁচে সুতো পরাতে শুরু করল। আমি দেখতে লাগলাম। বুঝতেই পারছেন, মদ খেয়ে খেয়ে তার চোখদুটো ছিল লাল টকটকে, হাতদুটো কাঁপছিল। সে কোটে ছুঁচ ঢুকিয়ে ঠেলতে লাগল কিন্তু ছুঁচ আর ঢোকে না; শেষে সে রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।"

" 'ভগবানই তোমার ভরসা, এমিলিয়া, মন্দ কাজকম্ম ছেড়ে দাও, চুপচাপ থাক, কেলেঙ্কারি কিছু কোরো না, রাত্তিরেও সিঁড়িতে কাটাবার কিছু নেই; আমার মুখ আর পুড়িও না।'

" 'কিন্তু আমি কি করব? জানি, আমি মাতাল, কারুর কোনো উপকারে নেই। শুধু আমার উপকারের দরুন তোমার জন্যে আমার বুকটা……'

"বলতে বলতে তার নীলচে ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল। খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা সাদা গালদুটো বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল; হঠাৎ অঝোর কান্নায় সে ফেটে পড়ল।…আমার বুকে ছুরির মত বিঁধে রইল ঘটনাটা।

"তারপর স্যর, বলবার আর কি আছে! সারা ব্যাপারটা এমনিই বোকা যে বলবার যোগ্য নয়। আমার একটা ঘোড়ায় চড়বার ব্রিচেস ছিল। খাসা ব্রিচেস। একজন জমিদার সেটা

অর্ডার দিয়েছিল, পরে সেটা খুব আঁটসাঁট হয়েছে বলে আর নেয়নি; সেই থেকে সেটা আমার কাছেই রয়ে গেছল। কি মারাত্মক ভুলই না হ'য়ে গেছে; পুরোনো জিনিসের বাজারে পাঁচ রুবল দাম উঠতে পারত! তখন এমিলাউনকার সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম, একদিন সে ফোঁটা মদ খেল না, পরের দিনও না, তার পরের দিনও ঠোঁটে ঠেকাল না। তার যেন বৈরাগ্য এল। মনমরা হয়ে বসে রইল। ভাবলাম, হয় চাঁদ তোমার পকেট গড়ের মাঠ, নয়তো তুমি সঠিক রাস্তায় পা দিয়ে মদ ছেড়েছ। এই অবস্থা, তখন ছুটির উৎসবের আর বেশি বাকি নেই। সান্ধ্য-প্রার্থনায় গেছলাম, ফিরে এসে দেখি এমিলিয়া জানালার ওপর বসে আছে, মদে চুর হয়ে। হায়, এই ব্যাপার! আমি কি কথাই না ভাবছিলাম, চাঁদ আমার! তারপর কি জন্যে মনে নেই আমার তোরঙ্গ খুলতে হ'ল, দেখি ব্রিচেসটা নেই। সব জায়গায় খুঁজলাম, ওটা গেছে। আমি বুড়ির কাছে ছুটলাম ওকে চোর ভেবে; কিন্তু এমিলিয়াকে একটুও সন্দেহ করিনি চোখের ওপর জলজ্যান্ত মদে চুর হ'য়ে বসে থাকতে দেখেও।

"বাড়িউলি বলল, 'না না, ব্রিচেস নিয়ে আমি কি করব; বলতো, আমি কি ওগুলো পরতে পারি?' 'এখানে কেউ এসেছিল কি?' জিজ্ঞেস করলাম। সে উত্তর দিল, 'কেউ আসেনি তো। সব সময়েই তো আমি এখানে আছি। এমিলিন ইলুইচ বেরিয়ে গেছল, আবার ফিরে এসেছে, ওই তো বসে রয়েছে, ওকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো না।'

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা এমিলিয়া, ব্রিচেসটা কেউ ধার নিয়েছে বলে কি তোমার মনে পড়ে, সে-ই যে যেটা জমিদারের জন্যে আমি তৈরি করেছিলাম?'

" 'না, আস্তাফি ইভানিচ,' আমি ওটা ছুঁইনি তো।'

"কি-ই বা হতে পারে! আমি চারদিক দেখতে লাগলাম,

খুঁজছি তো খুঁজছি, ব্রিচেসটা আর পেলাম না! এমিলিয়া তখন বেশ বসে বসে দুলছে। আমি সন্দেহ ক'রে তার দিকে তাকালাম।

" 'না, আস্তাফি, আমি তোমার ব্রিচেস নিইনি। তুমি ভাবতে পার, আমি নিইছি বলে, কিন্তু তা নয়', সে বলল।

" 'তাহলে কি বুঝব, এমিলিয়া ইলিচ, ওটা আপনা থেকেই উধাও হয়েছে?'

" 'তাই হবে বোধ হয়, আস্তাফি।'

"এ-কথা তার মুখ থেকে শোনবার পর আমি উঠে জানালার ধারে গিয়ে হাতে কাজ তুলে নিলাম। আমাদের নিচের তলায় একজন সরকারী চাকুরের একটা ওয়েস্টকোট অল্টার করছিলাম। মনে হল, এমিলিয়া টের পেয়েছে, আমি সাঙ্ঘাতিক চটে গেছি। পাপী মন, ঝড়ের আগে পাখিরা যেমন বুঝতে পারে, সেও তেমনি বরাত খারাপ টের পেল।

" 'শুনেছ, আস্তাফি ইভানোভিচ, (তার গলার স্বর কাঁপতে লাগল) হাসপাতালে কাজ করে আন্তিপ প্রোহোরিচ, ক'দিন আগে যে কোচোয়ানটা মারা গেল তার বউকে আজ বিয়ে করল…'

"আমি তার দিকে চাইলাম; বুঝল, চোখে রাগ আছে। বিছানায় উঠে খুঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে মুখে বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগল, 'না এখানেও তো নেই, বেটা, গেল কোথায়!'

"ও কি করে তা দেখবার জন্যে সবুর করলাম। দেখি খাটটার নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে। আর আমি সইতে পারলাম না।

" 'এমিলিন ইলিচ, বলি কি জন্যে তুমি হামাগুড়ি দিচ্ছ?' 'তোমার ব্রিচেসটা এখানে আছে কি না দেখতে; যদি এদিকে কোথাও পড়ে গিয়ে থাকে।' 'আমার খাটের তলা দিয়ে হামাগুড়ি দেবার তোমার কী কোনো অধিকার আছে?' 'কোনো অধিকার নেই আস্তাফি, ভাবলাম এদিকে দেখলে হয়ত পাওয়া যাবে।' আমি

জিজ্ঞেস করলাম, 'আবার আমাদের বিনিময়ে কোর-ট্যাক্সের মতো সেটা তুমি সত্যিই চুরি করনি?' 'না…আস্তাফি ইভানিচ।'

"ও কিন্তু মুখ নিচু করে যেখানে ছিল, খাটের তলাতেই বসে গেল। অনেকক্ষণ পরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। তার মুখটা দেখলাম কাগজের মত সাদা। উঠে গিয়ে জানালায় আমার মুখোমুখি বসে রইল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হঠাৎ উঠে আমার দিকে এগিয়ে এলো, দেখলাম, ফ্যাকাসে একদম ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাকে। বলল, 'না না, আস্তাফি ইভানিচ, আমি তোমার ব্রিচেসটা নিইনি।'

"তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, কাঁপা আঙুলে বুকে হাত বোলাচ্ছিল, গলার আওয়াজও কাঁপছিল, আমি ভয় পেয়ে জানালায় বসে রইলাম।

"আমি বললাম, 'আচ্ছা বেশ এমিলিন ইলিচ, আমায় ক্ষমা কর, আমি বোকা, তোমায় মিছিমিছি দোষ দেওয়ায় ঘাট হয়েছে। ব্রিচেসটার কথা ভেতে দাও। ওতে আমরা মরে যাব না। ভগবান আমাদের হাত দিয়েছেন, খেটে খাব। চুরিও করব না, আর গরিব লোকের কাছে ভিক্ষেও করব না। নিজেদের রুজি নিজেরাই রোজগার করে নেব।'

"এই কথা শুনে এমিলিয়া কিছুক্ষণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বসে পড়ল। সারা সন্ধেবেলাটা না নড়েচড়ে ঐভাবে কাটিয়ে দিল। শোবার সময়ও দেখি একইভাবে বসেছে। সকালবেলায় দেখি সেই কোটটা মুড়ি দিয়ে খালি মেঝের ওপর কুঁকড়ে রয়েছে। সেই থেকে লোকটাকে আমার অপছন্দ হ'তে লাগল। সত্যি, প্রথম ক'দিন আমার খুব খারাপ লাগলো। মনে হ'ত আমার নিজের ছেলে যেন আমায় ঠকিয়ে চুরি করেছে। দু হপ্তা ধরে এমিলিয়া একদম হুঁশে ছিল না। মনে হ'ল সে যেন মরবে পণ করে মদ টানছে। সকালে সে বেরিয়ে যেত, রাত্তিরে খুব দেরি ক'রে বাড়ি ফিরত। দু' হপ্তা ধরে, আমি তার গলা থেকে

কোন কথা শুনিনি। বোধ হয় বিবেক তাকে বলেছিল, কিংবা সে নিজের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল। অবশেষে এই পর্ব শেষ হল। তার টাকাকড়ি নিশ্চয়ই ফুরিয়েছে; আবার সে জানালার ধারে বসল। চুপচাপ তিনটে পুরো দিন ওখানে বসে রইল। হঠাৎ দেখি সে কাঁদছে। চোখ দিয়ে ফোয়ারার মত জল ঝরছে নীরবে, যেন সে এর কিছুই জানে না। এটা স্বয়, দেখতে বড় দুঃখের যে একজন বয়স্ক লোক, বিশেষ ক'রে একজন বুড়ো লোক নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কাঁদছে।'

" 'ব্যাপার কি এমিলিয়া?' জিজ্ঞাসা করলাম।

"সে কাঁপছিল। এই আমি প্রথম তার সঙ্গে কথা বললাম। 'কিছু না...আস্তাফি।' 'ভগবান তোমার ভরসা হোন এমিলিয়া, জিনিসটাকে যেতে দাও। পেঁচার মত এভাবে বসে আছ কেন?' 'আস্তাফি ইভানিচ, ওর জন্যে আমি ভাবছি না; ঠিক আছে, আমি একটা কাজ পেতে চাই।' 'কি কাজ?' 'যা হোক, আগে যে কাজ করতুম সেই রকম একটা, আমি একটা খবরও পেয়েছি...আমি তোমার দয়া অবহেলা করতে চাই না, কাজ পেলে তোমার সব খরচ শোধ করে দেব।' 'হয়েছে, হয়েছে এমিলিয়া, আগের মত এসো দিন কাটাই।' 'না, আস্তাফি, বোধ হয় তুমি এখনও ভাবছ... আমি তোমার ব্রিচেসটা ছুঁইনি।' 'বেশ, যা ভাল বোঝ, কর। ভগবান তোমার ভরসা হোন এমিলিয়ানোউস্কা।' 'না আস্তাফি, তোমার কাছে আমার আর থাকা হবে না, আমায় মাপ কর।'

"আমি বললাম, 'তোমায় যেতে বলছে কে?'

" 'না, তা নয়, আস্তাফি...আমার যাওয়াই ভাল।...'

"সে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর কোটটা চড়িয়ে নিল।

" 'নমস্কার, বিদায়, আমার আর পিছু ডেকোনা আস্তাফি ইভানিচ।' আবার সে কাঁদতে লাগল,—" 'আমি যাচ্ছি, তুমি আমার ওপর অন্ত রকম ব্যবহার করছ বলে।' 'অন্ত রকম ব্যবহার? আমি

তো একাই আছি, তুমিই তো ছেলেমানুষের মতো মিছে-মিছে কষ্ট পাচ্ছ।'

" 'না আস্তাকি ইভানিচ, আজকাল তুমি বাইরে যাবার আগে তোরঙ্গের চাবি লাগিয়ে যাও, আমার মনে বড় লাগে⋯বরং আমায় ছেড়ে দাও। তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি, আমাকে মাপ করো।'

"চ'লে গেল। একদিন ওর জন্যে বসে রইলাম। ভেবেছিলাম, সন্ধের হয়তো ফিরে আসবে। কিন্তু এল না। পরের দিনও না, তার পরের দিনও না। এত উদ্বিগ্ন হলাম যে রাত্তিরে ঘুমোতে পারলাম না। আমাকে বেজায় কাবু ক'রে দিয়ে গেছে লোকটা। চতুর্থ দিনে বেরিয়ে পড়লাম, সব ক'টা মদের আড্ডায় ঢুঁ দিলাম, এমিলিয়ানোভিচ্কা উধাও। ভাবলাম বেঁচে আছে কিনা, হয়ত বা কোন ঝোপের নিচে মরে পচা কাঠের মত পড়ে আছে। বাড়ি ফিরলাম দারুণ উদ্বেগ নিয়ে। পরের দিন আবার বেরব ভাবলাম। বোকা লোকটাকে একা ছেড়ে দেবার জন্যে নিজের ওপর রাগ হ'ল। পঞ্চম দিনে, সেদিনটা ছুটি ছিল, ভোর হতে না হতেই কে দরজা ঠেলল। এমিলিয়া এল। সারা মুখটা নীলচে, চুলগুলি কাদা, যেন সে রাস্তায় পড়ে ছিল, কাঠির মত সরু হ'য়ে গেছে। কোটটা খুলে ফেলে আমার পাশে তোরঙ্গের ওপর বসল।

"বললাম, 'এমিলিয়ানোভিচ্কা, যাক ফিরে এসেছ, খুশী হয়েছি। এখনও যদি না আসতে, আমি মদের দোকানগুলোয় আজও আর একবার যেতাম। কিছু খেয়েছ কি?'

" 'খেয়েছি, ধন্যবাদ আস্তাকি ইভানিচ।'

" 'পেট ভরে খাওনি বোধ হয়। কাল রাত্তিরের কপির ঝোল আছে, এর মধ্যে খানিকটা মাংসও আছে, আর এই নাও রুটি আর পেঁয়াজ। তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ওটা খারাপ হবে না।'

"এ-সব আমি তাকে খেতে দিলাম। তার গেলা দেখে বুঝলাম তিন দিন ধরে তার পেটে কোন দানাপানি পড়েনি। খানিকটা

তবুও এসে বললাম, 'এস এমিলিন ইলিচ, আজকের দিনটা তো ছুটি আছে?' সে কোনোমোনো করে লোভে হাত বাড়িয়ে বোতলটা ছুঁতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিল। তারপর বোতলটা বুকের কাছে এনে খানিকটা জামায় ফেলল। তারপর হঠাৎ বোতলটা টেবিলের ওপর রেখে আর মোটেই ছুঁল না।

"জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি এমিলিয়ানোউস্কা?' 'কিছু না, আর মদ খেতে ইচ্ছে নেই আস্তাফি ইভানিচ।' 'একদম ছেড়ে দিচ্ছ, না শুধু আজকে খাবে না?' জিজ্ঞাসা করলাম। কোন উত্তর দিল না। একমিনিট পরে দেখি হাতে মাথা রেখে ঝুঁকে পড়েছে।

" 'কি হ'ল। অসুখ করেছে নাকি, এমিলিয়া?'

" 'ভাল লাগছে না আস্তাফি।'

"তাকে ধরে আমি বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মাথা তার গরমে পুড়ে যাচ্ছিল, জ্বরে কাঁপছিল। সারা দিন পাশে বসে রইলাম। রাত্তিরে অবস্থা আরো খারাপ হ'ল। আমি তাকে রুটি মাখন পেঁয়াজ খেতে দিয়ে বললাম, 'এটা খেয়ে নাও, একটু ভাল লাগতে পারে।' সে মাথা নেড়ে বলল, 'না, আজ আর কিছু খাব না।'

"পরের দিন ডাক্তার ডাকতে গেলাম। ডাক্তার কোতো-প্রাপতের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল, কাছেই থাকতেন; তিনি এসে ওকে দেখে বললেন, 'অবস্থা বড় খারাপ, আমাকে এনে কোন লাভ হ'ল না, এক পুরিয়া পাউডার দিয়ে দেখতে পার।' আমি আর পাউডার খাওয়ালাম না, ডাক্তারবাবু মন দিয়ে দেখেছে বলে মনে হ'ল না।

"আর বেশি বাকি নেই, বুঝতে পারলাম। হাতে কাজ নিয়ে জানালার ধারে বসলাম। সেই বুড়ি স্টোভ ধরিয়ে দিল। সবাই চুপচাপ। এই ভবঘুরে লোকটার জন্যে মনটা খারাপ হ'ল। জানতাম, এমিলিয়া আমাকে লক্ষ্য করছে; সারা সকাল থেকে সে যেন

শক্তি সংগ্রহ করে কি-একটা বলতে চাইছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। বেচারীর মুখে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ফুটে বেরুচ্ছিল। আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু আমার চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ নামিয়ে নিল।

" 'আস্তাফি ইভানিচ।' 'কি এমিলিয়ানোভিচ?' 'আমার কোটটা যদি তুমি নাও, তাতে বেশি কিছু পাবে কি আস্তাফি?' আমি বললাম, 'ভাল; লোকে যে কত দেবে তা বলি কি করে? তিন রুবল হতে পারে।' সত্যি কথা বলতে কি, ওটা নিয়ে গেলে এক পয়সাও পেতাম না, বরং এই ছেঁড়া কম্বল বেচার জন্যে লোকে হাসত; তবু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম।

" 'আমিও ভাবছিলাম, তিন রুবল পাওয়া যেতে পারে—ওটা মোটা কাপড়ের তৈরি। তোমার কি ঠিক মনে হয়, তিন রুবল এর দাম?'

"উত্তর দিলাম, 'ঠিক জানি না এমিলিন, তবে যদি বেচতে চাও, তিন রুবল দাম হেঁকে দরদস্তুর শুরু করতে পার।'

"কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার কথা বলল।

" 'আস্তাফি!' 'ব্যাপার কি এমিলিয়ানোভিচ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

" 'আমি মরে গেলে, কোটটা বেচে দিও, কোটসুদ্ধ আমায় গোর দিও না। ওটা না পরলেও আমি ঠিকই থাকব, এর হয়ত কিছু দাম থাকতে পারে, তোমারও কোন কাজে লাগতে পারে।'

"আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না মশাই, ঠিক সেই মুহূর্তটা আমার বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছিল। দেখলাম, শিয়রে মৃত্যু। আবার আমরা দুজনেই চুপচাপ, এইভাবে একটা ঘণ্টা কেটে গেল। তখনও সে আমার দিকে চেয়ে, আমার চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল।

" 'একটু জল খাবে এমিলিন?'

" 'একটু খাও আভাকি, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন।'

"আমি তাকে খানিকটা জল দিলাম, খেয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, আভাকি ইভানিচ।'

"জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর কিছু চাও?'

" 'না আভাকি, কিছু চাই না, কিন্তু আমিই…'

" 'কি এমিলিয়া?'

" 'সেই ব্রিচেসটা,…আমি নিয়েছিলাম, আভাকি।'

"বললাম, 'ভগবান তোমায় ক্ষমা করবেন, এমিলিয়ানোভিচ, শান্তিতে বিদায় নাও…'

"আমার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল, আমি সরে গেলুম।

" 'আভাকি ইভানিচ…'

"সে কিছু বলবার চেষ্টা করছিল। একটুখানি নিজেকে বিছানায় উঁচু ক'রে নিয়ে কিছু বলবার জন্যে ঠোঁটটা নাড়াল। তারপর সে হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল, একটু পরে ক্রমেই সাদা হয়ে গেল। মুহূর্তে তার সমস্ত শক্তি লোপ পেল, বালিশে মাথাটা গড়িয়ে পড়ল, মুখ হাঁ করে একটুখানি শ্বাস নেবার চেষ্টা ক'রে ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপে দিল।"

প্রিয়া

সেমিনিঁয়াকু-র মেয়ের নাম ওলেত্যা। সেমিনিয়াকু ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এখন অবসরপ্রাপ্ত। ওলেত্যা পায়ের ওপর ভর দিয়ে আপন মনে ভাবছিল। গরম কাল। অবাধ্য মাছিগুলো বিরক্ত করছিল। ভালই লাগছিল ভাবতে যে সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। জলভরা কালো মেঘগুলো পুবদিক থেকে ভেসে আসছিল, আর ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাস।

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল প্রমোদ-উদ্যান 'টিভোলি'-র মালিক এবং পরিচালক কুকিন। উঠোনের এক পাশে তার ডেরা। হতাশার সুরে বলল, "আবার বিষ্টি পড়বে আজও। রোজ রোজ বিষ্টি। প্রত্যেকটা দিন।—আমাকে ঠিক পথে বসবার জন্যেই। হায় কপাল! একদম ডুবে গেলুম। প্রত্যেকটা দিন ক্ষতি হচ্ছে অসম্ভব।" নিজেই নিজের হাতদুটো শক্ত ক'রে ধরে বলে চলল, "এই হ'ল আমাদের জীবন ওলেত্যা সেমিনোভনা। মানুষকে কাঁদাবার পক্ষে এই ঢের। তুমি নিজের সব শক্তি উজাড় ক'রে খাটলে, দুশ্চিন্তায় রাতে তোমার ঘুম নেই; কিভাবে উন্নতি করা যেতে পারে সেই চিন্তায় সব সময় তুমি পাগল,—তারপর হ'ল কি? না, প্রথমেই বোকা মুখ্যু দর্শকের দল। আমি তাদের দিই সেরা সেরা গীতিনাট্য, মিলনাত্মক নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান; কিন্তু, তারা কি চায় তা? সূক্ষ্ম শিল্পকলার ছিটে-ফোঁটাও কি বোঝে তারা? ওরা চায় হল্লা। কিছু অশ্লীল দাও, তাই তারা চাইবে। তারপর দেখ আবহাওয়ার দিকে, প্রায় প্রত্যেকটি সন্ধের বিষ্টি পড়ছে। দশই মে শুরু হয়েছে, সারা জুন মাসটা কেটে গেল। নাঃ বিচ্ছিরি ব্যাপার। লোক আসে না;

কিন্তু তুমি তো জানো, বাড়িভাড়াও দিতে হবে; শিল্পীরা মাইনেটাও তো আশা করে।"

পরের দিন সন্ধ্যে আবার মেঘ জমা হ'ল এবং কুকিন পাগলা হাসিতে ফেটে পড়ে বললে, "পড়ুক বিষ্টি, বন্যায় সারা বাগানটা ডুবিয়ে দিক, আমাকেও দিক। জগতে দেখছি, আমার কোন শান্তি নেই। শিল্পীরা আমায় আদালতে হাজির করুক। আদালতই বা আমার কি করবে? হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দিক না, এমনকি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিক না। হোঃ হোঃ হোঃ।"

তৃতীয় দিনেও একই কাণ্ড ঘটল। ওলেঙ্কা নীরবে সধৈর্যে সব শুনত, কখনও তার চোখ থেকে জলও ঝরে পড়ত। অবশেষে কুকিনের বিষাদে সে চঞ্চল হ'য়ে উঠল আর তার প্রেমে পড়ল। কুকিন লোকটি খাটো, হাল্‌কা মুখ, ছোট পাতপাট্টা চুলটা বুরুশ-করা উঁচু দিকে; তার গলার স্বর ছিল সরু, এবং কথা বলার সময় মুখটা একদিকে বেঁকে যেত। নিরাশা যেন তার মুখে লেখা। এ-সব সত্ত্বেও সে ওলেঙ্কার প্রকৃত স্নেহ পেয়েছিল।

ওলেঙ্কা সব সময়েই কাকেও না কাকেও ভালোবেসে এসেছে, না ভালোবেসে যেন সে থাকতে পারে না। প্রথমে ভালোবাসত বাবাকে। তিনি এখন একটা শুকনো ঘরে অনড় হয়ে পড়ে থাকেন। পরে ভালোবাসত মাসীকে; তিনি মাঝে মাঝে ব্রিয়ান্স্ক থেকে আসতেন। আরো আগে, সে যখন স্কুলে যেত, তখন ভালোবাসত ফরাসী ভাষার শিক্ষককে। ওলেঙ্কা ছিল শান্ত সদয় করুণায়-ভরা এক তরুণী; কোমল, মুখের গড়ন ভদ্র, স্বাস্থ্যবতী। নরম সাদা গলায় একটা কালো তিল, সদা খুশী-মুখে স্মিত হাসি। পুষ্ট গোলাপী গালের দিকে চেয়ে ছেলেরা ভাবত—ভারী সুন্দর মেয়েটি; আর মেয়েরা কথাবার্তা বলতে গিয়ে কখন অজান্তে হাত দুটি ধরে ফেলে আপনা হতেই বলে ফেলত, 'তুমি যেন প্রেমিকা'।

যে-বাড়িতে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে এবং বাস করেছে, সেটার মালিক ছিল সে-ই। শহরের ধারেই বাড়িটা জিপসী কোয়ার্টারে, টিভলি-উদ্যান থেকে দূরে নয়। সন্ধ্যে ও রাতে বাগান থেকে ভেসে-আসা গানের রেশ ও আতসবাজি ফোটার শব্দ শুনতে পেত আর তার মনে হ'ত যেন কুকিন ভাগ্যের সঙ্গে লড়ছে তার প্রধান শত্রু উদাসীন দর্শকদের আক্রমণ ক'রে। তার হৃদয় খুশিতে আত্মহারা হয়ে যেত, ঘুমোতে তার ইচ্ছে করত না। সকালে যখন কুকিন বাড়ি ফিরত, ওলেঙ্কা জানতে পারত। জানালায় আস্তে টোকা দিয়ে মুখ ও একদিকের কাঁধ ফিরিয়ে সমবেদনায় মৃদু হাসত কুকিন।

কুকিন কথা পাড়ল এবং তাদের বিয়ে হ'য়ে গেল। যখন সে তার ঘাড়ের ও সুপুষ্ট স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কাঁধের পুরো সৌন্দর্য দেখতে পেল, সে আপনা হতেই হাত দুটো ধরে বলে উঠল, 'তুমিই আমার প্রিয়তমা!' নিজের মতো করে সে সুখী হ'ল। কিন্তু বিয়ের দিনটায় এবং সারা রাতটায় অনবরত বিষ্টি পড়ছিল বলে তার মুখ থেকে হতাশার চিহ্ন কখনো মোছেনি।

বিয়ের পর তারা সুখে বাস করতে লাগল। ওলেঙ্কা টিকিট ঘরে বসত, দেখত বাগানটা যাতে পরিষ্কার থাকে, খরচের দিকে নজর রাখত, মাইনে বেঁটে দিত। তার গোলাপী গালের আভা এবং মিষ্টি অকৃত্রিম হাসির ছটা সর্বত্র ঠিকরে পড়ত—অফিস ঘরের ছোট জানালায়, রঙ্গমঞ্চের পর্দার পাশে, খাবার ঘরে, পরিবেশনের টেবিলে। ইতিমধ্যেই সে পরিচিতদের কাছে বলতে শুরু করেছে যে থিয়েটারই হ'ল জগতের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য আনন্দ এবং শুধু থিয়েটারের সাহায্যেই একাধারে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ হওয়া সম্ভব। "কিন্তু সাধারণ দর্শকরা কি তা বোঝে?" সে মন্তব্য করে বলে, "ওরা চায় ভাঁড়। কালকে ছিল—এ বারনেস অব কন্ট এবং প্রায় সমস্ত বক্সগুলো

ছিল খালি। কিন্তু ভানিচ্‌কা আর আমি যদি অশ্লীল কিছু দেখাতাম, বিশ্বাস কর, থিয়েটারে তিলমাত্র জায়গা থাকত না। কালকে ভানিচ্‌কা আর আমি করছি—অরফিয়াস ইন দি আণ্ডার-ওয়ার্লড। তুমি নিশ্চয়ই আসবে।"

কুকিন থিয়েটার সম্পর্কে যা বলে তাই সে পুনরাবৃত্তি করত। তার মতোই সে দর্শকদের শিল্পকলা সম্পর্কে উদাসীনতার জন্যে গাল দিত। মহড়ার সময়ে বাধা দিয়ে শিল্পীদের ভুল শুধরে দিত, সঙ্গীতজ্ঞদের ব্যবহারে লক্ষ্য রাখত। যখন স্থানীয় কাগজে প্রতিকূল সমালোচনা বেরত, সে গভীরভাবে কাঁদত; প্রতিবাদ ও ব্যাখ্যা করবার জন্যে সম্পাদকের কাছে ছুটত।

শিল্পীরা তাকে ভালোবাসত। ভালোবেসে তার নাম দিয়েছিল, 'ভানিচ্‌কা আর আমি' এবং 'ডার্লিং'। শিল্পীদের দুঃখে সে দুঃখিত হ'ত ও খুচরো টাকা ধার দিত। কেউ ফেরত না দিলে, সে লুকিয়ে কাঁদত বটে, কিন্তু স্বামীর কাছে অভিযোগ করত না।

শীতটাও তারা কাটিয়ে দিল সুখে। সারা শীতকালটার জন্যে শহরে থিয়েটারটা তারা নিল। দু'চার দিনের জন্যে ভাড়াও দিত—কখনো ইউক্রেনিয়ান কোম্পানিদের, কখনো ম্যাজিক-ওয়ালাদের, কখনো স্থানীয় শৌখিন অভিনেতাদের। ওলেঙ্কা স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ফুটে উঠতে লাগল, কুকিন রোগা ও হালকা হ'তে লাগল আর সাংঘাতিক ক্ষতির অভিযোগ করতে লাগল যদিও অবশ্য সারা শীতে এমন-কিছু মন্দ ব্যবসা হয়নি। রাতে সে কাশলে ওলেঙ্কা রাস্পবেরি ও লেবু দিয়ে শরবৎ তৈরি করে দিত, কপালে ওডিকলন ভিজিয়ে দিত এবং সবচেয়ে নরম শাল দিয়ে তাকে ঢেকে দিত। একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে সে বলত, "তুমি আমার মণি, তুমি আমার সাত রাজার ধন এক মানিক।"

লেন্ট উৎসবের সময় কুকিন মস্কো গেল একটা কোম্পানিকে

নিযুক্ত করতে। একা ওলেঙ্কা ঘুমোতে পারত না। সব সময়ে জানালার ধারে তারার দিকে চেয়ে বসে থাকত। সে নিজেকে মুরগির সঙ্গে উপমা দিত, যেমন মোরগ ছাড়া মুরগি ডিমে তা দিতে বসতে পারে না, এমনিধারা চঞ্চল সে। মস্কোয় কুকিন আটকে পড়ে গেল। লিখল, ঈস্টারে সে ফিরে আসবে এবং ইতিমধ্যেই চিঠিতে টিভোলির বন্দোবস্ত করতে লাগল। কিন্তু সেই পবিত্র সপ্তাহের সোমবার সন্ধের শেষের দিকে হঠাৎ এক অমঙ্গলসূচক আওয়াজ এল। কে-যেন ফটকে ঢাকের মত পিটছে ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং। তার রাঁধুনি ঘুমে ঢুলছিল, খালি-পাছটো বলতে বলতে দরজা খুলে দিতে গেল।

ওধার থেকে কে তীক্ষ্ণ কাংস্য স্বরে বলল, "ভগবানের দোহাই দরজাটা খুলুন। আপনার একটা টেলিগ্রাম আছে।"

ওলেঙ্কা এর আগেও স্বামীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, কিন্তু এবার কেমন-যেন কি কারণে সে প্রায় মূর্ছিত হ'য়ে পড়ল। কম্পিত হাতে টেলিগ্রামের খাম খুলে পড়ল, 'আইভান পেত্রোভিচ আজ হঠাৎ মারা গেছেন, নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মঙ্গলবার।' নিচে কোম্পানির স্টেজ-ম্যানেজারের নাম।

ওলেঙ্কা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "আমার ডার্লিং, আমার ভানিচ্‌কা। কেন বিয়ে করতে গেলুম তোমায়। কেন তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। কেন আমায় ভালোবাসলে। কেনই বা অভাগী ওলেঙ্কাকে ছেড়ে গেলে।"

মস্কোর ভ্যাগানকভ গোরস্তানে মঙ্গলবার কুকিনকে কবর দেওয়া হ'ল। বুধবারে ওলেঙ্কা বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় পড়ে এত চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করল যে রাস্তা থেকে ও কাছের উঠোন থেকে তা শোনা যেত। সে-সব পথ দিয়ে

চলাচলের সময়ে পথিকরা বলত, "ডার্লিং ওল্‌গা সেমিনোভ্‌না স্বামীর জন্যে কাঁদছে।"

তিন মাস পরে কালো পোশাকে ওলেঙ্কা গির্জা থেকে ফিরছে, প্রতিবেশী ভাসিলি আন্দ্রিয়েচ পুস্তাভ্‌লভ্‌ তার পাশে পাশে চলতে লাগল। ব্যবসাদার বাবাকভের কাঠগোলার ম্যানেজার সে। পরিধানে তার সোলার টুপি, সোনার চেন লাগান ওয়েস্টকোট; তাকে ব্যবসাদারের চেয়ে জমিদারের মতোই বেশি দেখতে।

সে সোজা বলল, গলায় তার সহানুভূতির সুর, "যা ঘটে ভালোর জন্যেই ঘটে ওল্‌গা সেমিনোভ্‌না। একান্ত প্রিয় কেউ মারা গেলে বুঝতে হবে এইটাই ছিল ভগবানের ইচ্ছে এবং আমাদের মুখ বুজে তাঁর ইচ্ছের আত্মসমর্পণ করা উচিত।"

ওলেঙ্কাকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিল। সেই থেকে সারাদিন তার পরিষ্কার কণ্ঠ ওলেঙ্কার কানে বাজতে লাগল, চোখ বুজতেই চোখে ভাসতে লাগল তার কালো দাড়ি। ওলেঙ্কার তাকে খুব ভালো লাগল এবং মনে হ'ল, তার মনে সে যেন ছাপ এঁকে গেছে। খানিক পরে এক অল্প-পরিচিতা মহিলাকে একসঙ্গে কফি খাবার সময় পুস্তাভ্‌লভের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বলল, সে কত সম্মানিত ব্যক্তি এবং যে-কোন মেয়েই তাকে বিয়ে করলে সুখী হ'ত।

তিন দিন পরে পুস্তাভ্‌লভ্‌ নিজে এল। বেশিক্ষণ সে থাকল না এবং বেশি কথা সে বলল না, কিন্তু ওলেঙ্কা এত বেশি তাকে ভালোবেসে ফেলল যে সারারাত তার ঘুম এল না, যেন জ্বরে পুড়ছে। পরদিন সকালেই সে এক বয়স্কা মহিলার কাছে ছুটল। শীঘ্রই সে বিয়েতে প্রতিশ্রুতি দিল এবং তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

পুস্তাভ্‌লভ্‌ ও ওলেঙ্কা বিয়ের পর সুখে দিনযাপন করতে লাগল। সাধারণত সে কাঠগোলায় মধ্যাহ্ন ভোজের আগে পর্যন্ত থাকত, তারপরে কাজে বাইরে বেরিয়ে যেত। ওলেঙ্কা তার

কামরায় সন্ধে পর্যন্ত বসে হিসাব রাখত ও মাল-চালানির খবর রাখত।

ওলেঙ্কা পরিবার ও পরিচিতদের বলত, "কাঠের দাম কি বছরে শতকরা কুড়িভাগ করে বাড়ছে, আগে আমরা স্থানীয় কাঠেই ব্যবসা করতাম এখন ভাসিচ্‌কাকে মগিলেভ প্রদেশে কাঠ কিনতে যেতে হয়। উঃ, কি খাজনা সেখানে!" ভয়ের ভাব দেখিয়ে দু'গালে হাত দুটো রেখে বলত, "কি-ই ভীষণ খাজনা!"

তার মনে হ'ত, সে যেন কাঠ নিয়ে সারা জীবন কাটাচ্ছে, কাঠ কত জরুরী ও দরকারি জিনিস। কড়ি, বরগা, খুঁটি, তক্তা, বেড়া, ব্যাটন, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদি কথাগুলোর আওয়াজে এবং সংস্পর্শে যেন পরিচিত কিছু পাওয়া যাচ্ছে। রাতে সে খুঁটি ও তক্তার পাহাড়ের স্বপ্ন দেখত, একটানা গাড়ির সারি শহরের বাইরে থেকে কাঠ বয়ে নিয়ে আসছে। সে স্বপ্ন দেখত যেন এক রেজিমেন্ট কাঠের গুঁড়ি কাঠগোলায় যোদ্ধাদের মত কুচকাওয়াজ করছে। বিম ও তক্তাগুলো খটপট করে সশব্দে পড়ে যাচ্ছে, আবার একে অপরের ঘাড়ে উঠছে। ওলেঙ্কা স্বপ্নে চেঁচিয়ে উঠত এবং পাভ্‌লভ্‌ কোমল স্বরে বলত, "ওলেঙ্কা, কি হয়েছে? ওগো ওঠো!"

তার স্বামী যা ভাবত সেও তাই ভাবত। সে যদি ভাবত যে ঘরটা গরম কিংবা ব্যবসা মন্দা, ওলেঙ্কাও তাই ভাবত। তার স্বামী আমোদ-প্রমোদের ধার ধারত না এবং ছুটির দিনেও বাড়ি বসে থাকত, সেও তার সঙ্গে বাড়ি থাকত। তাদের বন্ধুরা বলত, "তোমরা সব সময়েই হয় আপিসে নয় বাড়িতে থাকো, থিয়েটারে বা সার্কাসে তোমাদের যাওয়া উচিত।"

সে শান্তভাবে জবাব দিত, "ভাসিচ্‌কা আর আমি সব সময়েই এত ব্যস্ত থাকি যে থিয়েটারে যাবার সময় পাই না। আমরা কাজের লোক, *হালকা ব্যাপারের ধার ধারি না।* কি কাজে লাগবে থিয়েটার?"

শনিবারে পুস্তাভালভ্ ও ওলেঙ্কা সান্ধ্য-উপাসনায় যেত এবং উপবাসের দিনে সকালের প্রার্থনায় যোগ দিত। গির্জা থেকে বাড়ি ফেরবার পথটা তারা পাশাপাশি পায়ে পায়ে ফিরত, মুখে তাদের শান্তির আভা, আমোদিত সৌরভ। ওলেঙ্কার রেশমী পোশাক আপনমনে দুলত। বাড়ি ফিরে এসে তারা একসঙ্গে চা খেত, সঙ্গে দামী কেক, নানা রকমের জ্যাম ও প্যাস্ট্রি। প্রত্যেক দিন দুপুরে ভেড়া বা হাঁসের মাংসের ঝোলের বা রোস্টের সুগন্ধে এবং উপবাসের দিনে মাছের গন্ধে পথচারীরা ক্ষুধিত বোধ না ক'রে পারত না। অফিসে একটা সামোভার সব সময়ে জ্বলত এবং খরিদ্দাররা চা ও রুটিতে আপ্যায়িত হতেন। সপ্তাহে একদিন তারা একত্রে স্নানাগারে যেত, একসঙ্গে ফিরত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হ'য়ে।

ওলেঙ্কা তার বন্ধুদের বলত, "আমরা সুখেই আছি, শুধু ভগবান যদি সবাইকে ভাসিচ্কা ও আমার মতো দিন দিতেন!"

যখন পুস্তাভালভ্ মগিলেভ প্রদেশে কাঠের জন্যে গেল, সে খুব অবসাদ বোধ করতে লাগল এবং রাতে ঘুমোতে পারল না, চোখের জল ফেলতে লাগল। কখনো সন্ধেবেলা সৈন্যদলের পশুচিকিৎসক স্মিরনিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসত—একজন তরুণ সে, বাড়িরই এক সারিতে বাস করে। সে তার সঙ্গে আলাপ করত বা তাস খেলত; এতে সে ভুলে থাকত। বিশেষ ক'রে তার সাংসারিক জীবনের গল্পগুলো ভালো লাগত। তার বিয়ে হয়েছিল এবং একটি ছেলেও আছে, এখন স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদাই থাকে। সে অবিশ্বাসের কাজ করেছে বলে এখন তাকে ঘৃণা করে; শুধু ছেলের খোরপোষের জন্যে মাসে মাসে চল্লিশ রুবল ক'রে পাঠায়। এ-সব শুনে ওলেঙ্কা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ত ও তার জন্যে দুঃখিত হ'ত।

বিদায় নেবার সময় সিঁড়ি পর্যন্ত বাতি ধরে এগিয়ে দিয়ে ওলেঙ্কা বলত, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমায় অবসাদে সঙ্গ দেবার জন্যে ধন্যবাদ, ঈশ্বর তোমায় ভালো রাখুন।"

তার কথাবলার ধরন হ'য়ে গেল স্বামীর নকলে। তার মতো শান্ত ও দৃঢ়ভাবে সে কথা বলতে শুরু করল। পশুচিকিৎসক সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, তখন ডেকে চেঁচিয়ে তাকে বলছে, "ভ্লাদিমির প্লাতোনিচ, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে নেওয়া ভালো। শুধু ছেলের জন্যেও তাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। ভয় পেও না, ছেলে তো দুদিন বাদেই সব জেনে ফেলবে।"

পুস্তভলভ্ ফিরে এলে তাকে সে পশুচিকিৎসকের অসুখী সাংসারিক জীবনের কথা বলল, দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল এবং ছেলেটির কথায় বলল, "বোধহয় সে ইতিমধ্যেই বাবাকে দেখবার জন্যে কাতর হয়েছে।" তারপর, হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রেরণায় দুজনেই একসঙ্গে চঞ্চল হয়ে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল যেন তিনি তাদের একটি সন্তান দেন।

এমনিভাবে পুস্তভলভ্‌রা পরম সুখে ছ'বছর কাটিয়ে দিল। এক শীতে ভাসিলি আন্দ্রিয়েচ কাঠগোলায় চা-পানের পর টুপি না নিয়েই কাঠের চালানি দিতে বাইরে বেরিয়ে গেলে তার ঠাণ্ডা লেগে গেল। সেরা ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগেরই জয় হ'ল এবং সে মারা গেল। ওলেঙ্কা আরো একবার বিধবা হ'ল।

"আমাকে ফেলে গেলে কেন প্রিয়তম?" তার স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সে কাঁদল, "কি ক'রে তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব, অভাগী পোড়াকপাল আমার! তোমরা আমায় দয়া করো।"

সে কালো পোশাক পরতে লাগল ও ইতিমধ্যেই টুপি ও দস্তানা পরা ছেড়ে দিল। কদাচিৎ বাড়ির বাইরে যেত, শুধু গির্জায় বা স্বামীর কবরে মাঝে মাঝে যাওয়া ছাড়া। বাড়িতে দেবদাসীদের মত জীবনযাপন করতে লাগল।

ছ'মাস কেটে যাবার পর শোক করা ছেড়ে দিল এবং জানালা থেকে পর্দাগুলো সরিয়ে দিল। মাঝে মাঝে সকালে রাঁধুনির সঙ্গে

দোকান করার জন্যে বাজারে তাকে দেখা যেতে লাগল। কিন্তু তার বাড়িতে কি ঘটেছে তা শুধু আন্দাজ ক'রে বলা যেতে পারত। তাকে বাগানে পশুচিকিৎসকের সঙ্গে চা খেতে দেখা যেতে লাগল। ওলেঙ্কাকে চেঁচিয়ে কাগজ পড়ে শোনাত। পোস্ট অফিসে কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে ওলেঙ্কা বলত, "শহরে সত্যি[illegible]র পশুদের তত্ত্বাবধানের কোন ব্যবস্থা নেই, ফলে ভীষণ অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায়, লোকেদের অসুখ, এ শুধু গোরু-ঘোড়ার রোগ দুধে সংক্রামিত হ'য়ে যায় বলে। নিজেদের স্বাস্থ্যের মতোই গৃহপালিত পশুদেরও যত্ন নেওয়া উচিত।"

সে পশুচিকিৎসকের মতামত পুনরাবৃত্তি করতে লাগল এবং সব বিষয়ে ঐ ধরনের মত হ'য়ে গেল তার। বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কোন আকর্ষণ ছাড়া সে বাঁচতে পারত না এবং সে তার নতুন সুখের সন্ধান সেই বাড়িরই এক সাথির মধ্যে খুঁজে পেল। অন্য কারুর বেলায় এমনধারা ঘটলে নিশ্চয়ই নিন্দনীয় হ'ত, কিন্তু ওলেঙ্কাকে এ রকম কেউ ভাবল না, তার জীবনের সবকিছুই সহজবোধ্য ছিল। সে এবং পশুচিকিৎসক কেউই কারুকে তাদের পরিবর্তিত সম্পর্কের কথা বলত না। লুকোবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সফল হ'ল না, কারণ ওলেঙ্কা যে কিছুই পেটে রাখতে পারত না। রেজিমেন্ট থেকে তার কোনো বন্ধু এলে ওলেঙ্কা চা ঢেলে দিতে গিয়ে বা খাবার পরিবেশন করার সময় আলাপ করত, শিংওলা গোরুদের মধ্যে প্লেগ বা অন্য রোগের সম্পর্কে বা শহরের কসাইখানা সম্পর্কে। পুভাভ্লভ্ ভারি গোলমেলে বোধ করত। অতিথিরা চলে যাবার পর হাত দুটো ধরে, ধীরে অথচ দৃঢ়স্বরে বলত, "মনে আছে, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলতে আমি মানা করেছি। যখন আমরা ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে কথা বলি, অনুগ্রহ করে বাধা দিও না। তাছাড়া, কথার মধ্যে কথা বলা—ভারি বিরক্ত লাগে।"

তার দিকে চেয়ে বিস্ময়ে ও উদ্বেগে সে বলত, "প্রিয় ভাবছি, তাহলে কি নিয়ে কথা বলি ?" চোখে জল নিয়ে সাশিকনে তাকে রাগ না করতে অনুরোধ করত—সে এটা সেরে নেবে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও এ-সুখ বেশি দিন টিকল না। পশুচিকিৎসক রেজিমেন্টের সঙ্গে বিদায় নিল, বিদায় নিল চিরতরে। রেজিমেন্ট বহু দূরে প্রায় সাইবেরিয়ার কাছে বদলি হ'য়ে গেল। ওলেঙ্কা একাই রইল।

বাস্তবিকই সে এখন একা। কিছুকাল আগে তার বাবা মারা গেলেন। তাঁর তেপায়া আরামকেদারাখানা উঠোনে পড়ে ধুলো খেতে লাগল। সে রোগা এবং কুৎসিত হয়ে যেতে লাগল। রাস্তায় লোকেরা তার দিকে তাকাত না এবং তাকে হেসে অভিবাদন করত না। স্পষ্টই তার জীবনের সেরা বছরগুলো কেটে গেছে। এখন নতুন ধরনের জীবন শুরু হয়েছে, এক অনিশ্চিত জীবন যার সম্পর্কে চিন্তা না করাই শ্রেয়। সন্ধ্যাবেলায় ওলেঙ্কা সিঁড়ির ওপর বসত। টিভোলির বাগান থেকে গান বা বাজি ছোঁড়ার শব্দ ভেসে আসত, কিন্তু তাতে তার মনে পূর্বস্মৃতি উদয় হ'ত না। উদাস দৃষ্টিতে শূন্য উঠোনের দিকে চেয়ে থাকত, চিন্তাহীন, সাধহীন ; রাত হ'লে শুতে যেত, আর স্বপ্ন দেখত শূন্য উঠোনের। খাওয়া-দাওয়া করত একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই।

সবচেয়ে খারাপ হ'ল এই যে, তার নিজস্ব কোন মতামত রইল না। সে চারদিকের সবকিছু দেখত, যা ঘটছে তাও বুঝত, কিন্তু কোন মতামত তৈরি করতে পারত না। কি নিয়ে কথা বলবে জানত না। মতামত না থাকাটা এক ভীষণ ব্যাপার। ধর, তুমি দেখছ একটা বোতল দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা বৃষ্টি পড়ছে, কিংবা একটা গোরুর গাড়ি ক'রে একজন চাষী যাচ্ছে ; কিন্তু কি জন্যে বোতলটা দাঁড়িয়ে আছে, বা কেন বৃষ্টি পড়ছে, বা কেন চাষীটি যাচ্ছে, তাদের মানে কি, বা তারপর কি হবে, তা যদি তুমি ব্যাখ্যা

করতে না পারে, তখন অবস্থাটা কেমন হয়। হাজার রুবল পারিশ্রমিকেও যদি না পায়? কুকিন, পুস্তাভালভ্ ও পশুচিকিৎসকের সাহায্যে ওলেঙ্কা সবকিছুই ব্যাখ্যা করতে পারত, যে-কোন বিষয়েই তার মন খুলতে পারত, কিন্তু এখন তার হৃদয় শূন্য উঠোনের মতোই শূন্য, জীবনের স্বাদ তিক্ত, তেঁতো শাকের মতোই তিক্ত।

আস্তে আস্তে শহরের পরিসর বড় হ'তে লাগল, জিপসী কোয়ার্টারটি ইতিমধ্যেই স্ট্রীট বলে পরিচিত। যেখানে আগে টিভোলির বাগান ও কাঠগোলা ছিল এখন সেখানে বাড়ি তৈরি হ'য়ে একসারি রাস্তা বেরিয়ে গেছে। কত তাড়াতাড়িই না সময় বয়ে যায়! ওলেঙ্কার বাড়ি পুরোনো হ'য়ে এল, কড়িতে মরচে ধরতে লাগল, আলোর শেডগুলো নষ্ট হ'য়ে গেল এবং সারা উঠোনটা আগাছায় ভরে উঠল। ওলেঙ্কা নিজেও কুৎসিত ও বুড়ি হ'য়ে উঠল। গ্রীষ্মকালে সে বসত সিঁড়িতে, হৃদয় রিক্ত ও ক্লান্ত। শীতকালে বসে থাকত জানালার ধারে বরফের দিকে চেয়ে! যখনই বসন্তের স্পর্শ অনুভব করত বা গির্জার ঘন্টা শুনত, সহসা স্মৃতির ঝলকে উপচে উঠত। অনুভব করত, তার হৃদয় ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। চোখে জল ভরে আসত, কিন্তু তা শুধু মুহূর্তের জন্যে। তারপর আবার সেই রিক্ততা। জীবনটা তার কাছে মনে হ'ত অর্থহীন। কালো বেড়াল ব্রিস্কা তার গায়ে আস্তে আস্তে গা ঘষতো, কিন্তু এই বেড়ালটির আদর ওলেঙ্কাকে চঞ্চল করে তুলতে পারত না। সে যা চাইছিল, এ তা নয়। সে চাইছিল এমনিধারা ভালোবাসা যা তার সারা সত্তায় বিরাজ করবে, তাকে চিন্তা দেবে, জীবনে লক্ষ্য দেবে ও ক্ষয়িষ্ণু রক্তকে উষ্ণ ক'রে তুলবে। ব্রিস্কাকে স্কার্ট থেকে সরিয়ে দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলত, 'দূর হ। আমার কোন দরকার নেই তোকে।'

এমনিধারা চলল দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, আনন্দহীন

ও উৎসাহহীন। রাঁধুনী মার্ভা যা বলত, বিনা তর্কে তাই সে মেনে নিত।

গ্রীষ্মকালে জুলাই-এর এক সন্ধের দিকে যখন শহরের পশুর পাল রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছে, সমস্ত খোলা জায়গাগুলো ধুলোর মেঘে ঢেকে গেছে, হঠাৎ কে যেন পাশের দরজায় ঘা দিল। ওলেঙ্কা নিজেই খুলে দিতে গেল এবং বাইরে তাকিয়েই মূর্ছা গেল। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে পশুচিকিৎসক, পরনে তার নাগরিকের পোশাক। আরো পাংশু হ'য়ে গেছে সে। হঠাৎ তার কাছে যেন সবকিছু ফিরে এল। ফেটে-পড়া অশ্রুর বন্যা সে প্রতিরোধ করে, কি সাধ্য। কোন কথা না ব'লে তার বুকে নিজের মাথা রাখল। আবেগের তীব্রতায় তারা টের পেল না, কেমন ক'রে তারা বাড়ির ভেতর এসে চা খেতে বসল।

আনন্দের শিহরণে ওলেঙ্কা বলল, "প্রিয়তম ভ্লাদিমির, কোথা থেকে ভগবান তোমায় পাঠালেন?" সে বলল, "আমি এখানে বরাবরের মত বসবাস করতে চাই, আমার চাকরীজীবন শেষ হ'ল; বুড়ো বয়সে সুখে ও নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার জন্যে এখানে এলাম। তাছাড়া ছেলেটাকেও স্কুলে পাঠাবার সময় হয়েছে। আর তুমি জান বোধ হয়, স্ত্রীর সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে।"

"কোথায় সে?" ওলেঙ্কা জিজ্ঞাসা করল।

"ছেলের সঙ্গে সে সরাইখানায়, আমি একটা বাসা খুঁজছি।"

"তাহলে এই জন্যেই ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন প্রিয় বন্ধু! তা বেশ, জায়গাটা খারাপ নয়; ভগবানের দোহাই, আমি তোমার কাছ থেকে কোন ভাড়া নেব না।" ওলেঙ্কা চঞ্চল হয়ে গেল, আবার কাঁদতে লাগল, "থাকো এইখানে, এইটুকুই আমার যথেষ্ট; ভগবান, সত্যিই এই-ই কি কম আনন্দের!"

পরের দিন তারা ছাদ রং করাল, দেওয়ালে কলি ফেরাল এবং

ওলেষ্কা কোমরে হাত রেখে ঘোরাফেরা করতে লাগল ও হুকুম দিতে লাগল। মুখে তার অত্যন্ত হাসি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সে পুনর্জীবন পেল, তরুণতর হ'ল এবং দীর্ঘ নিস্পন্দতা থেকে জেগে উঠল। পশুচিকিৎসকের স্ত্রী এল—সাদাসিধে, রোগা, ছোট ক'রে চুল-ছাঁটা, মুখের গড়ন খেয়ালী ধরনের। তার ছেলে সাশা বয়স অনুযায়ী দেখতে ছোটই, ন'বছর পেরিয়েছে। তার চোখদুটি পরিষ্কার নীল আর টুকটুকে গাল দুটি টোল-খাওয়া। ছেলেটি উঠোনে ঢুকতে না ঢুকতেই একছুটে বেড়ালটার কাছে গেল। সেই মুহূর্তেই তার প্রাণখোলা হাসি শোনা গেল।

"মাসীমা, এটা কি তোমার বেড়াল? বাচ্চা হ'লে আমাকে একটা দিও। মা তো ইঁদুরকে খুব ভয় করে।"

ওলেষ্কা বক্‌বকানিতে যোগ দিল ও চা ঢেলে দিল। হৃদয়টা তার আনন্দে ভরে উঠল; অনুভব করতে লাগল ছেলেটি তার নিজের। সন্ধেবেলায় খাবার ঘরে বসে সে যখন পড়া মুখস্থ বলছিল, আবেগভরে তার দিকে তাকিয়ে থেকে ওলেষ্কা আপন মনে বলল, 'কী সুন্দর ছেলে। তোমার এত বুদ্ধি। গালদুটো এত টুকটুকে।'

"একখণ্ড ভূমি চতুর্দিকে জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিলে, তাহাকে দ্বীপ কহে", সে চেঁচিয়ে পড়ছিল।

'একখণ্ড ভূমি চতুর্দিকে জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিলে তাহাকে দ্বীপ কহে।'—ওলেষ্কা মনে মনে আওড়াল। কোন ভাব-ধারা সে বহু নীরবতা ও নিস্পন্দতার পর এই প্রথম আবৃত্তি করল।

ইতিমধ্যেই সে নিজের মতবাদ ফিরে পেয়েছে। মধ্যাহ্নভোজের সময় খাবার মা-বাবাকে সে বলল, "ছেলেদের পক্ষে ইস্কুলে পড়াটা বেশ শক্ত ব্যাপার। তা সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষার চেয়ে বুনিয়াদি শিক্ষাটা ভাল। বুনিয়াদি শিক্ষাটা সবকিছু শিক্ষার পথ খুলে দেয়। তুমি ডাক্তার হ'তে চাও বা ইঞ্জিনিয়ার হ'তে চাও, তা তুমি হ'তে পারবে।"

শাশা স্কুলে যাওয়া শুরু করল। তার মা খারকভে বোনের বাড়ি বেড়াতে গেল, কিছুদিনের মধ্যে ফিরল না। তার বাবা প্রতিদিনই কোথায় যেন গভীর পান সেবাশুনা করতে যেত। এমনও হ'ত যে একসঙ্গে তিনদিনও তাকে বাইরে থাকতে হ'ত। ওলেষার মনে হ'ল যে শাশা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হচ্ছে। সংসারে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ছেলে, ক্ষুধায় মারা যাবে। কাজেই তাকে সে নিজের বাসায় নিয়ে এসে নিজের একটা ছোট ঘরে রাখল।

শাশা তার সঙ্গে বাস করার পর দু'মাস কেটে গেছে। ওলেষা প্রতিদিন তার ঘরে গিয়ে দেখত শাশা গালের তলায় হাত দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তাকে জাগাতে ভারি মায়া লাগত।

সে ধীরে বলত, "শাশা সোনা, ওঠো, স্কুলে যাবার সময় হয়েছে।"

সে উঠে পোশাক পরত, প্রার্থনা করত, তারপর প্রাতরাশে বসত, তিন গেলাস চা খেত, এবং দুটো বড় রুটি ও একটি ভিয়েনা রুটি মাখন দিয়ে খেত। সে তখনও সত্যিকারের ভাল ক'রে জাগেনি, কাজেই মেজাজ খুব ভাল থাকত না।

"তুমি ঠিকমতো পড়া করনি শাশা!" ওলেষা বলত এবং এমন-ভাবে তাকাত যেন এক দীর্ঘ যাত্রার পূর্বে বিদায় দিচ্ছে। "তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা, খুব মন দিয়ে পড়াশুনা কোরো, মাস্টার-মশাইয়ের কথা শুনো।"

"ও-সব কথা থাক!" শাশা বলত।

তারপর সে রাস্তায় বেরিয়ে যেত, একাই যেত, মাথায় একটা প্রকাণ্ড টুপি, পিঠে বইয়ের ব্যাগ। ওলেষা নীরবে পেছনে অনুসরণ করত।

"শা-শা, সোনা" সে বলত।

সে ফিরে তাকাত এবং ওলেষা তার হাতে একটা খেজুর বা চকোলেট গুঁজে দিত। যখন সে পাশের রাস্তায় মোড় ফিরত

যেখানে স্কুলটা ছিল, একজন লম্বা মোটা মহিলা তাকে অনুসরণ করায় শাশা লজ্জা পেয়ে ফিরে বলত, "মাসীমা, তুমি বাড়ি যাও, এখান থেকে আমি একলাই যেতে পারব।"

সে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত যে-পর্যন্ত-না শাশা ধীরে এগিয়ে গিয়ে স্কুলের ভিড়ে মিশে যায়। ও কতই না শাশাকে ভালোবাসত। এর আগে কখনই তার হৃদয় এত দ্বিধাহীনভাবে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠেনি। দিনের পর দিন তার মাতৃত্ববোধ গভীর হতে লাগল। গালে টোল-খাওয়া, স্কুলবয়-টুপি-পরা আগন্তুকের এই ছেলেটির সেবায় স্বচ্ছে সে তার সারা জীবন আনন্দাশ্রুর সঙ্গে সমর্পণ করতে পারে। কিন্তু কেন? সে বলতে পারে না। কে-ই বা বলতে পারে—কেন?

শাশাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে, সে শান্ত খুশী মনে বাড়ি ফিরত। গত ছ'মাসের সুখ ও হাসিতে তার মুখে নতুন লাবণ্য ফিরে এসেছে। যাদের সঙ্গে তার দেখা হত, খুশী হয়ে তারা তার দিকে তাকিয়ে অভিবাদন করত, "নমস্কার ওল্গা সেমিনোভনা, কেমন আছ ডার্লিং?"

"এখন স্কুলে লেখাপড়া শেখাটা ভারি শক্ত ব্যাপার। ঠাট্টা না, কালকে ফার্স্ট ক্লাশে একটা গল্প মুখস্থ করতে হয়েছে তারপর একটা ল্যাটিন অনুবাদ, তারপর একটা অনুশীলনী,—একটা ছোট ছেলের পক্ষে এতগুলো কি করে সম্ভব হয়?"

তারপর সে বলতে শুরু ক'রে দিল শিক্ষকদের সম্পর্কে, পড়া সম্পর্কে, পাঠ্যবই সম্পর্কে—ঠিক যেমন ক'রে শাশা তাকে বলেছে।

তিনটের সময় তারা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসত। সন্ধেবেলায় তারা একসঙ্গে পড়া তৈরি করত এবং অভিযোগ করত। তারপর শাশাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে প্রার্থনা করত এবং নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত—সুদূর ভবিষ্যতে যখন শাশা পড়াশুনা ক'রে একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, নিজের বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, ঘোড়া হয়েছে, বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে। সে শুয়ে

অনবরত এই-সব কথাই ভাবত, বোজাচোখ থেকে গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত। কালো বেড়ালটা পাশে শুয়ে ম্যাঁও ম্যাঁও করত।

হঠাৎ দরজায় ভীষণ জোরে শব্দ হ'ল। ওলেন্কা জেগে উঠে ভয়ে নিশ্বাস ফেলতে পারছে না, ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। আধ-মিনিট পরে আবার শব্দ হ'ল।

সে ভাবল—খারকভ থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল—শাশার মা শাশাকে খারকভে নিয়ে যেতে চাইছে···হায় ভগবান, সে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়,··· আমার মানিক শাশা।

নিরাশায় সে ডুবে গেল, হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। মনে হ'ল জগতে সে সবচেয়ে অসুখী। এক মিনিট পরে একটা আওয়াজ কানে এল—এ-তো পশুচিকিৎসক ক্লাব থেকে ফিরে এসে ডাকছে।

সে মনে মনে বলল, 'ভগবানকে ধন্যবাদ।' বুক থেকে ধীরে ধীরে ভার নেবে গেল, আশ্বস্ত হ'ল। আবার শাশার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, শাশা তখন পাশের ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কি লাভ এতে ?

শহর থেকে বড় বোন এসেছে গাঁয়ে ছোট বোনের কাছে। বড় বোন ব্যবসাদারের বউ; ছোট বোন চাষীর বউ। চায়ের সঙ্গে তাদের গল্প চলল। বড় বোন সগর্বে বলল তার শহুরে জীবনের কথা, কী বড় তাদের বাড়ি, বাচ্চাদের কত পোশাক-আশাক, কত ভালো তাদের খাওয়া-দাওয়া আর কিভাবে তারা থিয়েটারে যায়।

ছোট বোনের গাঁতে ঘা লাগল। সে বলতে লাগল ব্যবসাদার-জীবনে কত অসুবিধা এবং চাষী-জীবনে কত সুবিধা, সে-সব কথা। বলল, "তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন পাল্টে নিতে আমি চাই না। আমরা সাদাসিধে দিন কাটাই বটে, তবে দুর্ভাবনার কিছু নেই। তোমরা অনেক আড়ম্বরে থাক ঠিকই কিন্তু তোমাদের মোটা ব্যবসা করতে হয়, নয়ত মুশকিল। কথায় বলে, 'লাভ লোকসান যমজ ভাই'। আজ আমির কাল ফকির। চাষীর জীবনে অনেক শান্তি; আমাদের ঐশ্বর্য্য নেই তবু যা আছে তাই যথেষ্ট।"

"যথেষ্টই বটে। গোরু-ছাগলের মতো। না পোশাক, না সমাজ। তোমার স্বামীর কাজটা কি। কী দৈন্যদশায় না থাকো। এইভাবেই মরবে, তোমার ছেলেপুলেদেরও দশা হবে একই।"

ছোট বোন বলল, "তাই নাকি, আমরা ঠিকই আছি, আমাদের জীবন ভালোই। কারোকে মোসাহেবিও করি না, ভয়ও করি না। কিন্তু তোমাদের শহরের চারদিকে লোভ। আজ হয়ত ভালোই আছ, কাল তোমার স্বামী কারুর পাল্লায় পড়ে তাসে আর মদে সব উড়িয়ে দিতে পারে।"

তার স্বামী পাখম উনানের পাশে বসে সব শুনছিল।

সে বলল, "ঠিকই বলছ বউ। চাষের চিন্তায় চাষীর জীবন এত ব্যস্ত যে লোভে পড়ার কোন উপায় নেই। মুশকিল হল, বড্ড কম জমি। নিজের কথা বলতে পারি, যতটা জমি চাই তা পেলে শয়তানকেও ভয় পাই না!"

বোনেরা চা-পর্ব শেষ ক'রে পোশাক-আশাক নিয়ে আলোচনা করল, তারপর বাসন-কোশন সরিয়ে রেখে শুতে গেল।

শয়তান কিন্তু উনানের পেছন থেকে উঁকি মেরে সমস্ত কথাবার্তা শুনল। তার আনন্দ হ'ল এইজন্যে যে চাষী-বউ চাষীর মুখ থেকে অহঙ্কারের এই কথাটা বার করিয়েছে। শয়তান ভাবল, 'ঠিক আছে, তুমি আমি একসঙ্গে ব্যাপারটা বোঝাপড়া করে নেব।'

ওই চাষী পরিবারের প্রতিবেশী এক মহিলার তিন'শ চব্বিশ একর জমি ছিল। চাষীদের বিলিব্যবস্থা দিয়ে তিনি শান্তিতে বসবাস করতেন। চাষীদের ওপর তাঁর কোন জুলুম ছিল না। তিনি এক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে নায়েব নিযুক্ত করলেন। সে জরিমানা বসাতে শুরু করল। পাখম যতই সাবধান হোক না কেন, হয় তার ঘোড়া ওট মাড়িয়ে দেবে, নয় তার গোরু বাগানে ঢুকবে, নয় বাছুরগুলো ঘেসো জমিতে ঢুকবে—আর সব ব্যাপারেই জরিমানা!

পাখম জরিমানা দিত আর চাকর-বাকরদের ওপর চোটপাট করত। গ্রীষ্মকালটা নায়েবের জন্যে প্রায়ই ঝামেলা; শীতকাল এলে সে খুশী, গোরুবাছুরগুলো গোয়ালে থাকে; খড়ের টান পড়লেও জরিমানার ভয় নেই।

শীতকালে কথাটা রটে গেল যে ভদ্রমহিলা জোতজমি বেচে দেবেন, এবং নায়েববাবু সে-সব কিনে নেবার ব্যবস্থা করছেন। চাষীরা শুনে হা-হুতাশ ক'রে ভাবল, 'এবার নায়েববাবু হবে জমির

মালিক, আগের চেয়ে অনেক জরিমানা উশুল করবে, অথচ এ জমি ছাড়া তো বাঁচা যাবে না।'

সকলে মিলে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে নায়েববাবুকে জমিটা না বেচে তাদের বেচতে মিনতি ক'রে বলল—তারা বেশি দাম দেবে। ভদ্রমহিলা রাজী হলেন। চাষীরা সমবায় গঠন ক'রে জমিটা কেনার চেষ্টা করতে লাগল। সভার পর সভা হয়, তবু মতবিভেদ মেটে না। কোন রকমে একমত হ'তে না পেরে যে যার নিজের ক্ষমতা-মতো জমি কেনার কথা ঠিক করল। এতেও ভদ্রমহিলা রাজী হলেন।

পাখম শুনল যে এক প্রতিবেশী ভদ্রমহিলার কাছ থেকে কুড়ি একর জমি কিনেছে এবং তিনি অর্ধেক টাকা পরিশোধ করার জন্তে একবছর সময় দিয়েছেন। পাখমের হিংসা হ'ল। মনে ভাবল, 'ওরা তো সব জমি কিনে নেবে, আমার আর কিছু থাকবে না।' বউ-এর সঙ্গে যুক্তি করতে লাগল।

সে বলল, "লোকেরা তো সব জমি কিনে নিচ্ছে, আমাদেরও পঁচিশ একর কিনতে হবে, নয়তো নায়েববাবুর জরিমানার বহরে বাঁচা যাবে না।"

কিভাবে কেনা যায় ভাবতে লাগল। একশ রুবল তাদের জমান আছে, একটা বাচ্চা ঘোড়া ও অর্ধেক মৌমাছি বেচে দিল, ছেলেটাকে একটা শিক্ষানবীশিতে ঢুকিয়ে দিল, শালার কাছ থেকে কিছু টাকা নিল—এইভাবে অর্ধেক টাকা যোগাড় হ'ল।

পাখম মাঝের খানিকটা কাঠের জঙ্গল সমেত পঞ্চাশ একর জমি বেছে নিয়ে খরিদের ব্যবস্থা করতে মালিকের সঙ্গে দেখা করল। বায়না দিয়ে পঞ্চাশ একর জমি কিনল ও শহরে গিয়ে খরিদটা পাকা ক'রে নিল। তাকে অর্ধেক টাকা দিতে হ'ল, কথা রইল বাকি অর্ধেক টাকা দুবছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

পাখমের এখন নিজের জমি হ'ল। কেনা-জমিতে সে বীজ

বুনল। একবছরের মধ্যেই মালিকের ধার ও শালার ধার শোধ ক'রে ফেলে এবার মালিক হ'ল সে। নিজের জমি নিজে হাতে চষল, বীজ বুনল, খড় তুলল। নিজের জমির কাঠ নিজে হাতে কাটল, নিজের গোরু-ছাগল চরাল নিজের জমিতে। চাষের জমির ওপর দিয়ে ঘোড়া চড়ে যেত, চারদিকের ফসল চোখ ভরে দেখত আর আপন ঐশ্বর্যের গরিমায় আত্মপ্রসাদ লাভ করত।

এইভাবে চলল পাখমের জীবনযাত্রা ও সমৃদ্ধি। ষোল কলায় পূর্ণ হ'ত সব, যদি অন্য চাষীরা তার জমি দিয়ে যাতায়াত শুরু না করত। ওদের মানা করল, ওরা শুনল না। বাচ্চাগুলো তার গোচারণভূমিতে গোরু ছেড়ে দিত আর ঘোড়াগুলো রাত্তিরে পালিয়ে আসত তার ফসলে।

তাদের তাড়িয়ে দিত, পাখম তবু আদালতে যেত না। শেষে হাঁপিয়ে উঠে জেলা আদালতে যাবার কথা ভাবল। সে জানত যে চাষীরা হিংসেয় এ-কাজ করছে না; অসাবধানী তাই। কিন্তু ভাবল 'ব্যাপারটা কিছুতেই তো ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাহলে ওরা তো সবসময়েই ওখানে গোরু চরাবে; ব্যাটাদের শিক্ষা দিতে হবে।' ওদের আদালতে হাজির করল কয়েকবার। একজন একজন ক'রে জরিমানা দিতে লাগল। চাষীদের মনে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমতে লাগল। তারা আবার তার জমির ওপর দিয়ে যাতায়াত শুরু করল, এবার ইচ্ছে ক'রে। রাত্তিরে কেউ কাঠের জঙ্গলে গিয়ে ডজনখানেক গাছ কেটে ফেলল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে ভীষণ রেগে গেল। কেউ না কেউ ঢুকেছিল; চারদিকে ডালপালা ছড়ান, কাণ্ডগুলো পড়ে রয়েছে। একটা ঝাড় ছাড়া সব ছোট ছোট ঝাড়গুলো কেটে ফেলা হয়েছে।

পাখম রেগে কাঁই। ভাবল, 'কার কম্ম জানতে পারলে বেটাকে তুলো ধুনে দেব।'

ঠাহর করল, কে হ'তে পারে? সাইমন ছাড়া আর কেউ নয়।

সাইমনের খুঁজে ঘরে গেল। কিছু দেখতে না পেয়ে কথা কাটাকাটি ক'রে ফিরে এল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল নিশ্চয়ই এ সাইমনের কাজ। আদালতে নালিশ রুজু ক'রে দিল। কোন প্রমাণ না থাকায় চাষীটা ছাড়া পেল। আরো রেগে গেল পাখম। হাকিমদের ওপরেও চটল। বলল, "আপনারা পাজি লোকদের দিকে, আপনারা ভদ্দরলোক হ'লে আসামীদের ছেড়ে দিতেন না।" এইভাবে সে হাকিমদের সঙ্গে ঝগড়া করল, চাষীদের সঙ্গে ঝগড়া করল। চাষীরাও ওর বাড়ি পুড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখাল।

এই সময় গুজব উঠল যে, লোকজন নতুন জায়গায় চলে যাচ্ছে। পাখম ভাবল, 'নিজের জমি ছেড়ে আমার যাবার দরকার কি? কোন প্রতিবেশী যদি চলে যেতে চায়, আমি তার জমি কিনে নিতে পারব। ও জমিগুলো নিজের হ'লে আরও ভাল ক'রে বাঁচতে পারব, এখন কেমন যেন একঘেয়ে জীবন।'

পাখম ঘরে বসে আছে, এমন সময় একটি চাষী তার ঘরে এল। চাষীটি সেই গ্রামের ভেতর দিয়ে কোথায় যেন যাবে। ওরা চাষীটিকে রাত্তিরের আশ্রয় দিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আলাপ শুরু হ'ল। পাখম জিজ্ঞেস করল, "ঠাকুরের ইচ্ছেয় এখন চলেছ কোথায়?

চাষী উত্তর দিলে যে সে ভল্গার ওদিকে কাজ করতে গেছল, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। গল্প করতে লাগল কত লোক ওখানে গিয়ে কলোনী করেছে, ওরা সমাজ তৈরি করে ফেলেছে, প্রত্যেককে পঁচিশ একর ক'রে জমি দেওয়া হয়েছে—এই-সব গল্প। বললে, "ওখানের জমি এখানকার মতো নয়, ওখানকার জমি এমন যে যদি তুমি ঘোড়া-খাবার ঘাসের বীজ ছড়াও, ঘাসগুলো ঘোড়ার চেয়েও লম্বা হবে, আর এত পুরু যে পাঁচ মুঠোয় এক-এক আঁটি। একটা চাষী গিয়েছিল ওখানে, হাতে তার কানাকড়িও ছিল না, এখন তার ছ'টা ঘোড়া আর দুটো গোরু।"

পাখমের হৃদয় উদ্দীপ্ত হ'ল। ভাবল 'কষ্ট করে এখানে পড়ে থাকা কেন, যখন এত ভালো ক'রে থাকা যায়? এখানের জোতজমি বেচে দিই, টাকাকড়ি নিয়ে নতুন ক'রে শুরু করি, নিজের পুরো একটা খামার গড়ে তুলি। এই ছোট্ট জায়গায় থাকাটা লজ্জার ব্যাপার। নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করব।'

তৈরি হ'তে লাগল এক বছর, তারপর যাত্রা শুরু করল। সামারা থেকে লঞ্চে ক'রে ভল্গা দিয়ে নেমে এসে চারশ ভার্স্ট পায়ে হেঁটে সঠিক জায়গায় পৌঁছাল। যা শুনেছিল, দেখল ব্যাপারটা তাই। চাষীদের সাড়ম্বর জীবনযাত্রা, মাথাগুনতি পঁচিশ একর জমি। সে এসে সংখ্যায় বাড়বে বলে তাদের আনন্দই হ'ল।

পাখম খোঁজখবর নিয়ে শরৎকালে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এসে সব জিনিস বেচতে শুরু করল। জমি বেচল বেশ লাভে, বাড়ি বেচল, গোরু-বাছুর বেচল, পঞ্চায়েৎ থেকে নাম কাটিয়ে নিল। বসন্তকাল এলে সপরিবারে নতুন জায়গায় চলে এল।

একটা বড় গ্রামে গিয়ে পাখম নাম লেখাল। মাতব্বরদের ভেট দিয়ে নিজের কাগজপত্তর দেখাল। পাখমকে মেনে নেওয়া হ'ল। তার সংসারে পাঁচজন লোকের জন্যে তাকে মোট একশ' পঁয়ত্রিশ একর জমি কয়েকটা জায়গায় ছড়িয়ে বেঁটে দেওয়া হ'ল গোচারণভূমি ছাড়া। গেড়ে বসল সে। গবাদি পশু দেওয়া হ'ল তাকে। আগে তার যা জমি ছিল এখন তার তিনগুণ জমি। জমিও বেশ উর্বর। গোড়ার যুগে সে যেভাবে দিন কাটিয়েছে এখন তার চেয়ে দশগুণ ভালোভাবে দিন চলে। তার যা দরকার এখন সে ততটা জমি ও পশুর খাদ্য পেয়েছে। গবাদি পশুও সে রাখল খুশিমতো।

প্রথমে সে গুছিয়ে বসল এবং বাড়িঘর গোছগাছ ক'রে নিল। এবার সে খুশী, বাড়িটায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগল কিন্তু

বেশী দিন যেতে না যেতে তার নাম মনে হ'তে লাগল বাড়িটায় যেন জায়গা নেই।

প্রথম বছর একটা জমিতে গম বুনল পাখম। ফসল ভালোই হ'ল। সে চাইল আরো জমিতে বোনে; কিন্তু গমের উপযুক্ত জমির অভাব। হাতে যে জমি রইল তাও বিশেষ কাজের নয়। ওখানে যেসো বা পতিত জমিতে গম চাষ হয়, এক বছর কি দু-বছর গমের চাষ হ'য়ে যাবার পর জমিটা পতিত থাকে তারপর ফিরে ঘাস গজালে পরে আবার বোনা হয়।

বগড়াবাঁটি শুরু হ'ল, একে অপরের চেয়ে পয়সা করল বেশি। সকলেই চায় বুনতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গরিবদের হাত পাততে হ'ল পাইকারদের কাছে।

পাখমও চাইল যতটা পারে বুনতে। পরের বছর গেল এক পাইকারের কাছে, একবছরের জন্যে একটা জমি নিল। বাড়তি বুনল এটা, ভালো ফসল হ'ল। কিন্তু জমিটা ছিল গ্রাম থেকে বেশ দূরে, পনর ভার্সটা যেতে হ'ত। সে দেখল চাষী-পাইকাররা কি ভালো বাড়িতে থাকে, কত তাদের পয়সা। পাখম ভাবল, 'ঐরকমই তো চাই, আরও জমি যদি কিনতে পারি, একটা খাসা বাড়ি করব। একটা ছোট জমিদারি মতো হবে।'

যতই দিন যায় প্রত্যেক বছর পাখমের পক্ষে জমির খাজনা দেওয়া গুরুভার হ'য়ে দাঁড়াল আর জমির বিলি-ব্যবস্থা নিতেও অনেক সময় নষ্ট হ'তে লাগল। কোথাও একটু ভালো জমির খোঁজ হ'লে চাষীরা হুড়মুড় ক'রে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সেটা ভাগ ক'রে নিত। পাখমেরই কেবল দেরী হ'য়ে যেত, আর সস্তায় জমি পাওয়া তার ভাগ্যে জুটত না। কিন্তু তৃতীয় বছরে সে গোচরণভূমির একটা বড় অংশ বন্দোবস্ত নিল, এই অংশটা আগে সাধারণ জমি ছিল, চাষীরা সবাই মিলে ব্যবহার করত। চাষীরা আদালতে ছুটল, কিন্তু ইতিমধ্যে পাখম জমিটা চাষ ক'রে ফেলেছে, তবু জমিটা তাকে ছেড়ে দিতে হ'ল।

পাখম চারদিকে খোঁজ-খবর করতে লাগল, কোথায় জমি একদম নিয়ে নেওয়া যায়। এমন সময় এক চাষীর সঙ্গে তার আলাপ হ'ল। চাষীটার সাড়ে তেরশ' একর জমি, জমিটা সে ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে। পনরশ' রুবলে সে বিক্রী করতে রাজী হ'ল, অর্ধেক টাকার জন্তে জমিটা বাঁধা থাকল। কথাবার্তা প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে এমন সময় এক ব্যাপারী এসে তার ঘোড়ার জন্তে কিছু ঘাস পাখমের কাছ থেকে চাইল।

চা খেতে খেতে বেশ সৌহার্দপূর্ণ আলাপ চলল তাদের। ব্যাপারী জানাল যে সে সুদূর বাসখির থেকে ফিরছে। বললে, "ওখানে আমি চার হাজার একর জমি কিনেছি, আর আমার দিতে হয়েছে মোট এক হাজার রুবল।"

পাখম খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করতে লাগল, ব্যাপারী তাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

সে বলল, "মোট কাজটা আমি যা করেছি তা হ'ল এই যে বুড়ো মোড়লকে খুশী করেছি। এক চেষ্ট চা আর শ'খানেক রুবল দামের কার্পেট ও আটপৌরে পোশাক বিলিয়েছি আর যারা মদ খায় তাদের কিছু মদ। আমার দাম পড়ল একর প্রতি দশ কোপেক।" দলিল দেখিয়ে সে বলল, "আমার জমিটা হ'ল একটা ছোট নদীর ধারে, ঘাসের আঁচল বিছানো সমস্ত নদীর কিনারাটা।"

পাখম আরো জিজ্ঞেস করে, কি করে কোথায় পাওয়া যাবে।

ব্যাপারী বললে, "জমিটা বছর-খানেকের মধ্যে পেয়ে যেতে পার। ওরা সব বাসখিরিয়, ভেড়ার মত বোকা, একেবারে জলের দামে জমি পেয়ে যাবে।"

পাখম ভাবতে লাগল, 'এবার যদি সাড়ে-তেরশ' একর জমির জন্তে হাজার রুবল খরচ করি, আমি একটা আস্ত গাধা; মাথার ওপর ধারের বোঝা চুলোয় যাক, এক হাজার রুবল দিয়ে যত জমি চাই তা যখন পাচ্ছি!'

ওখানে যাবার পথটা জেনে নিল, তারপর ব্যাপারীকে বিদায় দিয়ে সে দৃঢ়সংকল্প হ'ল যাবেই যাবে। বাড়িটা বৌ-এর জিম্মায় রেখে, সঙ্গে নিজের একজন লোক নিয়ে যাত্রা শুরু করল। শহরে পৌঁছে কিনল এক চেস্ট চা, উপহার দেবার জিনিস-পত্তর, মদ, ব্যাপারী যা যা বলেছিল। তিনশ' তিরিশ মাইল পথ তারা গেল। সপ্তম দিনে তারা বাসখির সীমান্তের কাছে এল। ওরা থাকত একটা ছোট নদীর কিনারায় ঘাসে-ভরা সমতলভূমিতে, ওদের কুঁড়েঘরের চাল ছিল উলে-ছাওয়া। ওরা জমি চাষ করত না, রুটিও খেত না। ওদের পালিত পশুগুলো মাঠে চরে বেড়াত, ঘোড়াগুলো চরত পালে পালে। ঘোড়ার বাচ্চাগুলো বাঁধা থাকত কুঁড়ের পেছনে, তাদের মা-ঘোড়াগুলোকে দিনে দুবার কাছে নিয়ে এসে দুধ দুয়ে নিত। ওই দুধ থেকে 'কৌমিশ' তৈরি করত। মেয়ে-ছেলেরা কৌমিশ মন্থন করে পনীর তৈরী করত। চাষীরা জানত শুধু কৌমিশ ও চা খেতে, ভেড়ার মাংস খেতে এবং বেণু-বাঁশের বাঁশী বাজাতে। সবাই অতিথিপরায়ণ, সুখী; সারা গরমকালটা উৎসবে মেতে থাকত। লোকগুলো মিশমিশে কালো, রুশভাষায় কথা বলতে পারত না।

বাসখিররা পাখমকে দেখতে পেয়েই ঘর থেকে ছুটে এসে তাকে ছেঁকে ধরল। দো-ভাষী পরিচয় করিয়ে দিল। পাখম বলল যে সে তাদের জমি দেখতে এসেছে। বাসখিররা খুশী হয়ে তাকে একটা ভালো কুঁড়েঘরে নিয়ে গিয়ে কম্বল বিছিয়ে গদির বসবার জায়গা ক'রে চা ও কৌমিশ খেতে দিল। একটা ভেড়া কেটে তার মাংসও খেতে দিল।

পাখম তার ঠেলা-গাড়ি থেকে উপহারের সামগ্রী নিয়ে এসে ওদের বিতরণ করল এবং চা বেঁটে দিল। বাসখিররা আনন্দে আত্মহারা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে দোভাষীকে বলতে বলল:

দোভাষী বলল, "ওরা বলতে বলছে যে তোমাকে ওদের ভাল লেগেছে। আমাদের একটা রীতি আছে যে অতিথিকে খুশি করা এবং তার উপহারের প্রতিদান দেওয়া। তুমি আমাদের উপহার-সামগ্রী দিয়েছ। এখন বল, আমাদের কি আছে যা পেলে তুমি খুশি হবে, আমরাও তা প্রতিদানে দিতে পারব।"

পাখম বলল, "সবচেয়ে খুশি হ'ব, তোমাদের কিছু জমি পেলে। আমার দেশে জমির বড় অভাব, চাষ করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। তোমাদের অনেক জমি, খুব ভালো জমি, এরকম জীবনে কখনো দেখিনি।"

দোভাষী তার কথা অনুবাদ ক'রে ওদের বললে ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করল। পাখম তাদের কথা বুঝতে পারল না, তবু এইটুকু বুঝল যে ওরা ওকে সুনজরে দেখেছে। ওরা গলা ফাটিয়ে কথাবার্তা বলছে, হাসাহাসি করছে। তারপর চুপ ক'রে পাখমের দিকে ফিরল, তখন দোভাষী বলল :

"ওরা বলতে বলছে যে তোমার সহৃদয়তায় ওরা খুশি হ'য়ে যত জমি তুমি চাও তা ওরা দিতে রাজী আছে। শুধু হাত দিয়ে কোন জমিটা চাও দেখিয়ে দিলে সেই জমিটা তোমার হবে।"

ওরা আবার কথাবার্তা চালিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু করল। ওরা কি বলাবলি করছে জানতে চাইলে দোভাষী বলল, "ওদের কেউ কেউ বলছে যে মোড়লের মত নেওয়া দরকার, তাছাড়া হ'তে পারে না। আবার কেউ বলছে যে মোড়লের মতের দরকার নেই।"

বাসখিররা নিজেদের তর্কাতর্কি চালিয়ে যেতে লাগল। এমন সময়ে হঠাৎ একজন লোক ঢুকল তার মাথায় শেয়ালের চামড়ার টুপি। ঘরে ঢুকতেই ওরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল। দোভাষী জানাল, ইনিই মোড়ল স্বয়ং।

পাখম তক্ষুনি সেরা পোশাকটি বার ক'রে এক পাউণ্ড চায়ের

সঙ্গে তা মোড়লকে উপহার দিল। মোড়ল তা গ্রহণ ক'রে সবচেয়ে ভাল জায়গায় গিয়ে বসল। বাসখিররা ওকে সব-কথা বলল। মোড়ল শুনে মাথা নেড়ে পাখমের সঙ্গে রুশভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

সে বললে, "ভালো কথা, যা বলছ হ'তে পারে, যেখান থেকে খুশি জমি নাও, অনেক তো জমি আছে।"

পাখম বললে, "তোমাদের এই ভালো কথার জন্তে অনেক ধন্তবাদ। তোমাদের অনেক জমি আছে দেখেছি, আমিও খুব বেশি জমি চাই না। আমাকে শুধু বলে দেবে ঠিক কতটা জমি আমার হবে। যত তাড়াতাড়ি হয় জমিটা মেপে আমাকে দলিল করে দেবে যাতে ওটা আমার নিজের হয়। তোমরা সবাই লোক ভালো, জমিটা আমায় দিচ্ছ; কিন্তু এমন তো হতে পারে, তোমাদের ছেলেরা জমিটা ফিরিয়ে নিতে চাইল।"

মোড়ল বললে, "ঠিক কথাই বলছ, ওটা দলিল ক'রেই দেওয়া হবে।"

পাখম আরো বলল, "আমি শুনেছি যে একজন ব্যাপারী এখানে এসেছিল, তোমরা তার সঙ্গে জমির লেন-দেন করেছ; আমার সঙ্গেও একটা ব্যবস্থা কর, এইটাই আমি চাই।" মোড়ল কথাটা বুঝল। বললে, "তা হতে পারে, আমাদের একজন দলিল-লিখিয়ে লোক আছে, তাকে নিয়ে শহরে গিয়ে দলিল পাকা ক'রে দেব।"

পাখম জিজ্ঞেস করল, "দাম কি হবে?"

"আমাদের দাম একটাই আছে—দিনে এক হাজার রুবল।" পাখম বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, "দিনে—মাপটা কি? কত একারে এক দিন হবে?"

সে বলল, "তা তো বলতে পারি না, আমরা দিনের হিসাবে বিক্রী করি: একদিনে যতটা জমি ঘুরে আসতে পারবে, ততটা জমির দাম হ'ল এক হাজার রুবল।"

পাখম বিস্মিত হয়ে ভালো করে জিজ্ঞেস করল, "একদিনে তো অনেকটা জমি আমি ঘুরে আসতে পারি।"

মোড়ল হেসে বলল, "সবটাই তোমার হবে, শুধু একটা শর্ত যে তুমি যেখান থেকে শুরু করবে সেই দিনের মধ্যেই সেখানে ফিরে আসতে হবে, নয়ত তোমার টাকা তামাদি হয়ে যাবে।"

পাখম বললে, "জমিটা ঘুরে ঘুরে আমি চিহ্ন করব কি ক'রে?"

"ভালো, আমাদের যেখানে দাঁড়াতে বলবে, আমরা দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি গিয়ে একটা ক'রে গোল চিহ্ন করবে, একটা কোদাল নিও, যেখানে ইচ্ছে একটা গর্ত খুঁড়ে চারপাশের চাপড়া তুলে জমা ক'রে চিহ্ন দিও; আমরা সেখানে গিয়ে একটা লাঙল দিয়ে গর্ত থেকে গর্তে যোগ করে দেব। যেভাবে ইচ্ছে ঘুরতে পার, শুধু সূর্য অস্ত যাবার আগে যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানে ফিরে আসতে হবে। যতটা ঘুরে আসতে পারবে সব জমিটাই তোমার।"

পাখমের আনন্দ ধরে না। বাসখিররা পাখমের জন্যে মাটিতে বিছানা ক'রে দিল যাতে সে আরাম পায়। তারপর বিদায় নেবার সময় বলে গেল যে সূর্য ওঠবার সময় বন্দুকের শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সব আসবে।

সারা রাত পাখমের চোখের পাতা পড়ল না, ভোরের মুখে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল। মনে হ'ল সে যেন নিজেকে সেই কুঁড়ে ঘরটায় শুয়ে থাকতে দেখছে, বাইরে থেকে কার যেন হাসির আওয়াজ কানে আসছে। তার মনে হ'ল, বাইরে কি হচ্ছে দেখার আগ্রহ নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, দেখল যে সেই বাসখিরির মোড়লটা তার কুঁড়ে ঘরের সামনে বসে পাশ ফিরে হাসছে।

হাসবার কারণ কি জিজ্ঞেস করা মাত্র দেখল যে সে তো বাসখিরির মোড়ল নয়, যে-ব্যাপারীটা জমির কথা বলেছিল সে-ই। ব্যাপারীকে ঠাহর ক'রে কতক্ষণ হ'ল সে এখানে এসেছে যেই জিজ্ঞেস

করতে যাবে, অমনি তার মনে হ'ল ও তো ব্যাপারী নয়, ওরা নদী দিয়ে নেমে এসেছিল সেই চাষীটা। তারপর পাখম দেখল, সেই চাষীটাও নয়, শয়তান বসে—পায়ে ক্ষুর, মাথায় শিং, তার সামনে পড়ে রয়েছে একটা লোক, খালি পায়ে সার্ট আর অন্তর্বাস পরে। লক্ষ্য ক'রে দেখল, পড়ে-থাকা লোকটা অন্য কেউ নয়, সেই-ই। ভয় পেয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল।

মনে মনে প্রশ্ন করল, কি-সব স্বপ্ন দেখছিলাম? চারদিক তাকাল, আধ-ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল ভোর হ'তে শুরু করেছে। ভাবল, লোকজন নিশ্চয়ই উঠতে আরম্ভ করেছে, এবার শুরু করা যাক।

পোশাক পরল, গাড়িতে তার নিজের লোকটা ঘুমচ্ছিল, তাকে ঘোড়া জুততে বলে বাসখিরদের ডাকতে বেরল।

তাদের সে বলল, "চলো, সময় হয়েছে, এবার জমি মাপতে বেরোই।"

বাসখিররা উঠল, মোড়ল এল। ওরা কৌমিশ খেতে শুরু করল, পাখমকেও চা খেতে ডাকল কিন্তু ওর দেরি করতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না।

সে বলল, "যেতেই যদি হয়, এখনই বেরবার সময় হয়েছে।"

বাসখিররা তৈরি হ'ল। কেউ চলল ঘোড়ায় পিঠে, কেউ গাড়িতে। পাখম তার নিজের হালকা গাড়িটাতে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চলল, একটা কোদালও নিল। ঘাসে ঢাকা স্তেপভূমির দিকে চলল। একটা টিপির কাছে গিয়ে ওরা গাড়ি থেকে ঘোড়া থেকে নেমে এক জায়গায় জড় হ'ল। মোড়ল পাখমের কাছে এসে জমির দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল:

"এই যে যতদূর চোখ যায় দেখছ সব জমি আমাদের, যা তুমি চাও নিতে পার।"

পাখমের চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সমস্ত অঞ্চলটা ঘাসে ভর্তি,

হাতের তালুর মত সমতল, পোড়া পায়রার মত কালো, যেখানটায় খোঁদল, সেখানটায় বুকসমান উঁচু ঘাস দিয়ে ভরা।

যোড়ল মাথা থেকে শেয়ালের চামড়ার টুপিটা খুলে মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল :

"এই হ'ল চিহ্ন, এখান থেকে শুরু করো, এখানেই আবার ফিরে আসতে হবে, যতটা জমি ঘুরে আসবে, তোমার হবে।"

পাখম টাকাটা বার ক'রে টুপির ওপরে রাখল ; কোটটা খুলে ফেলল, ভেতরের জামাটা রইল গায়। কোমরের কাপড়টা ভাল ক'রে জড়িয়ে নিয়ে রুটির একটা ছোট থলি কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, বেল্টে জলের একটা ছোট বোতল ঝুলিয়ে নিল, পায়ের পাটারটা আঁট ক'রে নিয়ে, লোকটার কাছ থেকে কোদালটা নিয়ে যাত্রা শুরু করার জন্তে প্রস্তুত হ'ল।

সূর্যের দিকে মুখ ক'রে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগল যতক্ষণ না দিকচক্রবাল ছাড়িয়ে সূর্য ওঠে। দিগন্তে সূর্যকিরণ পৌছানমাত্রই কাঁধের ওপর কোদাল তুলে নিয়ে স্তেপভূমিতে সে যাত্রা শুরু করল।

সে এগোতে লাগল জোরেও নয় আস্তেও নয়। এক ভার্সট মতো গিয়ে থামল, একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে মাটির চাপড়াগুলো উঁচু ক'রে দিল যাতে দূর থেকে দেখা যায়।

আরো এগোতে লাগল, যতই এগোয়, ততই গতি দ্রুত করে। যেতে যেতে আরো ছোট ছোট গর্ত খুঁড়তে লাগল।

পাখম পেছন ফিরে তাকাল, রোদ্দুরে টিপিটা তখনও দেখা যাচ্ছে ; লোকেরা টিপির ওপর দাঁড়িয়ে ; গাড়ির চাকার বেড়গুলো চক্‌চক্‌ করছে। ও অনুমান করল পাঁচ ভার্সট মতো এসেছে। খানিকটা সে উষ্ণ হয়েছে এবার, গা থেকে জামাটা খুলে কাঁধের ওপর ফেলে চলতে লাগল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে বুঝল প্রাতরাশের সময় পেরিয়ে গেছে।

পাখম ভাবল, এক প্রহর কাটল, চার প্রহরে তো একদিন; এখন ফেরাটা খুব সকাল-সকাল হবে; জুতোটা খুলে ফেললেই হবে।

সে বসে পড়ে জুতোটা খুলে বেল্টে বেঁধে নিয়ে আবার চলতে লাগল। চলতে আরাম পেল। ভাবল, আরও ভার্সট-পাঁচেক যাই, তারপর বাঁদিকে মোড় ঘুরব। এ জমিটা খুব ভাল, ছেড়ে দিলে বোকামি হবে।

যতই এগোয় ততই ভাল জমি বেরোয়। সোজা আরও এগোতে লাগল। ঘুরে তাকাল, ঢিপিটা দেখা যায় কি যায় না, মানুষগুলোকে পিঁপড়ের মতো কালো ফোঁটা ফোঁটা দেখাচ্ছে, কিছুই আর চক্‌চক্ করতে দেখা যাচ্ছে না।

পাখম ভাবল, বেশ, এদিকটায় অনেকটা নিয়েছি, এবারে ঘোরা উচিত। বড্ড তেতে গেছি তো, একটু জল খেয়ে নিই।

সে থামল, একটা গর্ত খুঁড়ে চাপড়াগুলোর স্তূপ করল, তারপর ফ্লাস্ক খুলে জল খেয়ে বাঁদিকে মোড় নিয়ে এগোতে লাগল। খুব ঘন ঘাস রৌদ্রে উত্তপ্ত।

ক্লান্তিবোধ করতে শুরু করল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে বুঝল এখন মধ্যাহ্ন-ভোজের সময়। বসল। রুটি ও জল খেল। শুলো না। ভাবল যদি শোয়, ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

একটুখানি বসে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। বেশ আরাম ক'রে এগোতে লাগল, খাবার খেয়ে গায়ে নতুন জোর পেয়েছে, কিন্তু তখনও বেশ গরম। সত্যিই তো সূর্য হেলতে শুরু করেছে, কিন্তু তবু সে এগোতে লাগল। মনকে বুঝ দিল,—একটা ঘণ্টা কষ্ট সহ্য কর যদি, সারা জীবনটাই তো আরামে কাটাতে পারবে।

তখনও সে এগোতে লাগল—এই দিকে সে অনেক দূর গেল। বাঁদিকে মোড় ঘুরতে সে চাইছিল বটে কিন্তু ওখানকার ঢালটা চমৎকার রকমের সবুজ, তখনও সে চলতে লাগল। এই অংশটা

তার সম্পত্তির মধ্যে না-পাওয়াটা বেদনার হবে, কাজেই সে সোজা চলতে লাগল। খোঁড়লটা সে খুঁড়ল, গর্ত ক'রে চিহ্ন দিল এবং তার জমির দ্বিতীয় কোণ তৈরি হ'ল।

টিপির দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল। গরমের জন্যে আবছা দেখাচ্ছে সব, লোকজনদের কোনমতে সামান্য দেখা যাচ্ছে।

পাখম ভাবল,—পাশগুলো বেশ বড়ই করেছি, এই পাশটা ছোট করতে হবে।

তৃতীয় পাশের জন্যে সে চলতে শুরু করল; তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখল বেশ খানিকটা নেমে গেছে। তৃতীয় পাশের জন্যে মাত্র দু'ভার্সট গেল; যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, সেখানে ফিরতে পনর ভার্সট।

ভাবল সে,—নাঃ যদিও আমার জমিদারিটা মাথাভারি হ'য়ে যাচ্ছে, সোজাসুজি আমার ফিরে যাওয়াই উচিত, তাছাড়া আমি তো অনেকটা জমিই নিয়েছি।

একটা ছোট গর্ত তাড়াতাড়ি খুঁড়ে চিহ্ন ক'রে নিল; এবার চলল সোজা ঢিপির দিকে।

ফেরার বোঝাটা এবার ভারি ঠেকতে লাগল। ঘামে সে নেয়ে গেছে। ছড়ে-যাওয়া কেটে-যাওয়া খালি পা-টা আর যেন চলতে চায় না। একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে মন চাইল, কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার থামবার উপায় নেই। সূর্য তো থামবে না, ক্রমেই ঢলে পড়তে লাগল।

সে ভাবল,—হায় হায়! আমি কি ভুল ক'রে ফেললাম? আমি কি অনেকটা নিয়ে ফেলেছি, আরো তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

ঢিপির দিকে সে তাকাল—তাতে রোদ্দুর পড়েছে। ওটা অনেক দূরে অথচ সূর্য দিকচক্রবাল থেকে বেশি উঁচুতে নেই। সে জোর পা চালাতে লাগল। চলতে ভীষণ কষ্ট হ'তে লাগল তবুও

সে বেগ বাড়াল। এবার দৌড়তে শুরু করল। মাথার টুপি ফেলে দিল, কোদাল দিয়ে দৌড়নর স[illegible]নিতে লাগল।

ভাবল সে,—হায়, বড্ড লোভী হ'য়ে পড়েছিলাম, সব গেল বুঝি, সূর্যাস্তের আগে আর পৌঁছতে পারছি না।

নিঃশ্বাস নিতে তার বেশ কষ্ট হ'তে লাগল, বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে তার মনে ভয় ঢুকে গেছল। তার সার্ট ও অন্তর্বাস গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেল ঘামের জন্যে। গলা শুকিয়ে গেল। কামারের হাপরের মতো তার বুক ওঠানামা করছে, যাঁতার ঘড়ঘড় শব্দের মত তার বুক থেকে শব্দ বার হ'তে লাগল, পা-দুটো যেন তার ভারে নুয়ে পড়ে যাচ্ছে। দারুণ উদ্বিগ্ন হ'ল সে। ভাবল,—আচ্ছা, এই অসম্ভব চাপে যদি আমি মরে যাই।

এখুনি পড়ে মরে যাবে বলে তার ভয় হ'তে লাগল, কিন্তু তবু সে থামতে পারল না।

ক্রমেই কাছে এগোতে লাগল, বাসখিরিয়দের চেঁচামেচি শিষ দেওয়ার শব্দ তার কানে এল, আর শিষ দেওয়ার জন্যেই তার বুক আরো ধড়ফড় ক'রে উঠল।

পাখম তার শেষ শক্তি সংগ্রহ ক'রে দৌড়তে লাগল, সূর্য তখনো দিগন্তে যাই-যাই করছে; কেমন আবছা হ'য়ে এলো, রক্তের মত লাল একটা আভা, যার সঙ্কেত মৃত্যু। সূর্য প্রায় ডুবে এল, সেও কিন্তু আর বেশি দূরে নয়। সে দেখল টিপির ওপর লোকজন তাকে উৎসাহিত করে হাত-পা নাড়ছে, শেয়ালের চামড়ার টুপিটা মাটির ওপর পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে তার টাকা। দেখল—মোড়ল বসে রয়েছে মাটিতে, কোমরে হাত দিয়ে। পাখমের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবল—অতো জমি, কিন্তু ভগবান বোধহয় আমায় তা ভোগ করতে দেবে না। হায়, নিজের সর্বনাশ নিজে করলাম। এ আমি পাব না।

নিজের শক্তি নিঃশেষ ক'রে সামনের দিকে এগোতে লাগল;

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল অনেকটা, পা-দুটো কোন রকমে তাকে পড়ে যেতে দেয়নি। ঢিপিটার কাছে পৌঁছতেই হঠাৎ অন্ধকার হ'য়ে এল। চোখে পড়ল, সূর্য অস্ত গেছে। ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠল।

পাখম ভাবল, সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রায় থেমে যাচ্ছিল, কিন্তু বাসখিরিয়দের চেঁচামেচি তখনও কানে আসাতে তার মনে পড়ল, সে সমতলে আছে তাই সূর্য অস্ত গেছে বলে তার মনে হয়েছে ; কিন্তু ঢিপিটার ওপরে যারা আছে তাদের কাছে সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। পাখম একটি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে ঢিপির ওপরে ওঠবার চেষ্টা করল। ওখানে তখনও আলো। সামনে মোড়ল বসে কোমরে হাত দিয়ে, মুখে তার হাসি।

তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। একটি আর্তনাদ মুখ দিয়ে বেরোল, 'ওঃ'। পা-দুটো তাকে আর ধরে রাখতে পারল না, শেয়ালের চামড়ার টুপিটার দিকে হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গেল।

মোড়ল চেঁচিয়ে বলল, "সাবাস জোয়ান, বেশ ভালো রকমের জমিই তো বাগিয়েছ।"

পাখমের লোকটা তাড়াতাড়ি তার দিকে ছুটে গেল, ধরে পা-দুটোর ওপর তাকে খাড়া করিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরল শুধু এক ঝলকা রক্ত। সে এখন মৃত।

বাসখিরিয়রা জিভ দিয়ে চ্যা-চ্যা আওয়াজ ক'রে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু মোড়ল মাটিতে বসে রইল, নিঃশব্দ হাসিতে সে ফেটে পড়ছিল। অবশেষে টুপিটা থেকে টাকাগুলো নিয়ে সে উঠে পড়ল। দলবল নিয়ে চলে যাবার সময় পাখমের চাকরকে বলল, "গভীর করে গর্ত খুঁড়িস।"

পাখমের চাকর কোদাল হাতে নিয়ে তার কবরের জন্য গর্ত খুঁড়ল, মাথা থেকে পা যতটুকু লম্বা ঠিক ততটুকুই—ছ' ফিট—তারপর তার দেহটাকে মাটি চাপা দিয়ে দিল।
